চাঁদমামা
জুলাই ১৯৭৩
৭০

Photo by: B. BHANSALI

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁতওঠার
সময় ব্যাথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯
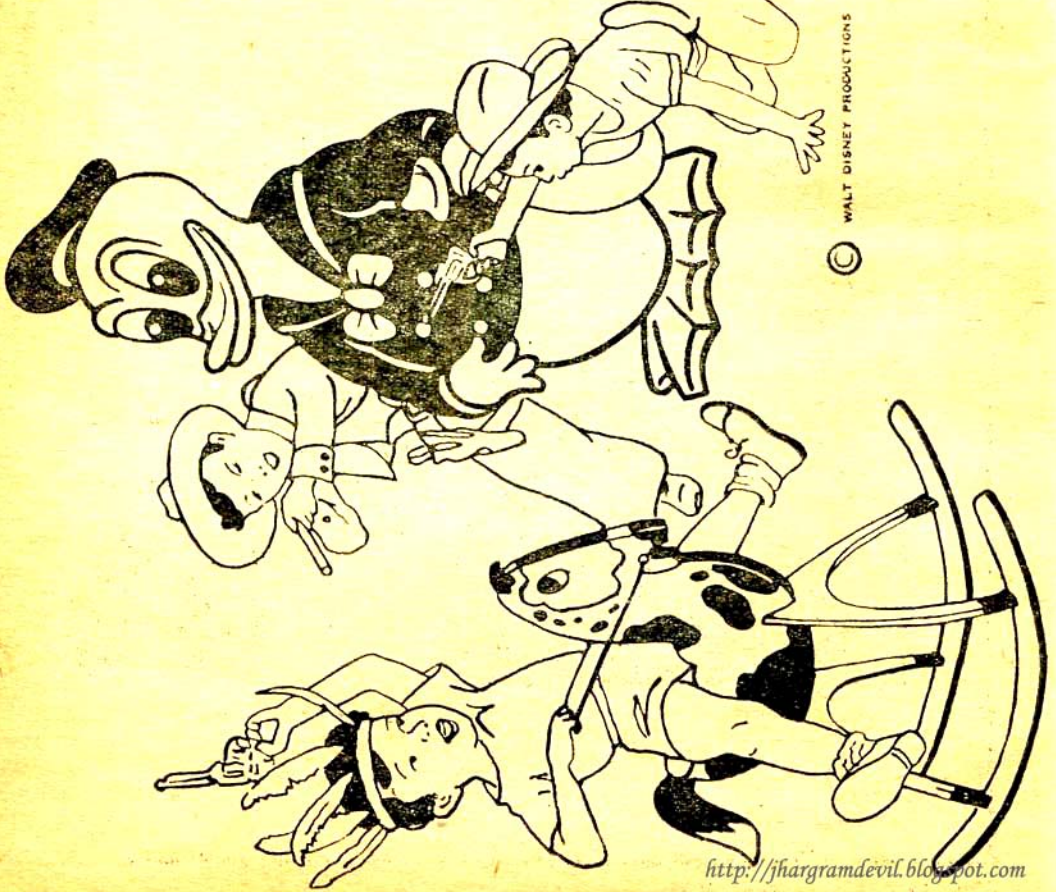
চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপানি

সাধারণ মানুষের নিজস্ব কোন মত কি নেই ? তারা কি সব সময় পরের কথায় চলে ? মানুষ কাজ করে জনসাধারণের প্রশংসা পাওয়ার আশায়। কিন্তু তা কি অত সহজে বোঝা যায় ? 'ঘুমন্ত রাক্ষস' কাহিনীতে এইসব প্রশ্নের সমাধান পাব।

'ভূত ছেড়ে গেছে' গল্পটি বেশ মজার। 'নিবিড় বন্ধুত্ব' খুব ভাল লাগবে। 'চন্দ্র-ভানু'তে আছে মজার ম্যাজিক। আনন্দ পাওয়া যাবে 'কুকুরের ব্যবসা', 'কবির সম্মান' ও 'টাকার গাছ' পড়ে। যক্ষপর্বত, মহাভারত ও শিবলিলা চলছে।

খণ্ড ২ জুলাই ১৯৭৩ সংখ্যা ১

অমর বাণী

তৃণাদপি লঘু স্তুলঃ,
তুলাদপি চ যাচকঃ,
বায়ুনা কিম্ ননীতো সৌ ?
ত ময়ম্ যাচয়ে দিতি ! ॥ ১ ॥

[তৃণের চেয়ে তুলো হাল্কা, তুলোর চেয়ে যাচক হাল্কা। কিন্তু হাওয়া যাচককে উড়িয়ে দেয় না, কারণ সে হাওয়ার কাছেও যাচনা করবে।]

বালসখীত্ব, মকারণ হাস্যম্,
স্ত্রীষু বিবাদ, মসজ্জন সেবা,
গার্দভয়ান, মসংস্কৃত বাণী
ষট্ষু নরো লঘুতা মুপযাতি। ॥ ২ ॥

[বাচ্চাদের সঙ্গে মৈত্রী, অকারণ হাসি, মহিলাদের সঙ্গে ঝগড়া করা, গাধার উপর চড়া, সংস্কারহীন বাণী—এই ছটা হাল্কা জিনিস।]

কিম্ পৌরুষম্ রক্ষতি যো ন বার্তান্ ?
কিম্ বা ধনম্ নার্থিজনায় যৎস্যাৎ ?
সা কিম্ ক্রিয়া যা ন হিতানুবদ্ধা ?
কিম্ জীবিতম্ সাধু বিরোধী যুদ্ধে ? ॥ ৩ ॥

[শরণাগতদের যে পৌরুষ রক্ষা করতে পারে না তা কোন্ কাজের? যাচকদের যে ধন দেওয়া যায় না তা থেকেই বা কি লাভ? যে কাজে কারো কোন হিত হয় না সে কাজের কি প্রয়োজন? তেমনি ভাল লোকের সঙ্গে যে শত্রুতা করে তার জীবন কিসের জন্য।]

ক্ষুদ্র

কুসুমকুমারের বিয়ে

চন্দনপুর গ্রামে দেব ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার ছিল কমল-লোচনা নামে এক কন্যা। মেয়েটি খুব সুন্দরী। দেব ভট্টাচার্যের কুসুমকুমার নামে এক শিষ্য ছিল। কুসুমকুমার ও কমল-লোচনা গোপনে পরস্পরকে ভালবাসত।

ইতিমধ্যে দেব ভট্টাচার্য অন্য এক পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে ঠিক করলেন। ব্যাপারটা জানতে পেরেই কমললোচনা কুসুমকুমারের কাছে খবর পাঠাল ঃ "বাবা আমার বিয়ে দেবার তোড়জোড় করছেন। তুমি আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা কর।"

এই খবর পেয়ে কুসুমকুমার একটা জায়গায় কমললোচনাকে যেতে খবর পাঠাল। সেখান থেকে তার চাকর ঘোড়ায় করে নিয়ে যাবে।

কমললোচনা নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দেখে একটা লোক ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু কুসুমকুমারের চাকর কমললোচনাকে মালিকের বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে অন্য পথে নিয়ে গেল। সকালে কমললোচনা দেখল সে এক শহরে এসে গেছে। তার কেমন যেন লাগল। তাকে প্রশ্ন করল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি? তোমার মালিক কোথায়?"

"আমার মালিক এখানে কোথায়? তার সাথে তোমার কি দরকার? আমি তোমাকে বিয়ে করব।" চাকর বলল।

কমললোচনা খুব বুদ্ধিমতী। সে চাকরকে বলল, "একথা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন? অনেক দেরি করে ফেললে। শুভ কাজে দেরি করতে নেই। তুমি আর দেরি না করে বিয়ের ব্যবস্থা কর।"

কমললোচনার কথায় বিশ্বাস করে চাকর সেখানেই ঘোড়া ছেড়ে বিয়ের জিনিসপত্র জোগাড় করতে চলে গেল।

চাকরের চলে যাওয়ার সাথে সাথে কমললোচনা ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে থামল এক ফুলবাগানের বুড়ো মালীর কাছে। বৃদ্ধকে সে সব কথা বলল। বৃদ্ধ তার সমস্ত কাহিনী শুনে নিজের বাড়িতে থাকতে দিল।

ইতিমধ্যে বিয়েতে যা কিছু লাগে সে সব জিনিস নিয়ে চাকর ফিরল। কিন্তু দেখতে পেল না কমললোচনাকে। সেখানে তাকে ও ঘোড়াকে দেখতে না পেয়ে চাকর বুঝল সে বোকা বনেছে। তারপর সে কুসুমকুমারের কাছে ফিরে গিয়ে বলল, "হুজুর, মেয়েদের মন দেবতারাই বুঝতে পারে না আপনিতো কোন ছার। আমাকে কিছু লোক ধরে ফেলল। কিছু লোক ঘোড়া নিয়ে পালাল। আমি হুজুর অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে পেরেছি।"

কুসুমকুমার চাকরের কথা বিশ্বাস করল। কিছুদিন পরে কুসুমকুমারের বাবা ছেলের বিয়ের জন্য এক মেয়ে দেখল। বর পক্ষের লোক বিয়ের কাজে যাওয়ার পথে কমল-লোচনা যে ফুল বাগানে ছিল সেখানে বিশ্রাম করছিল। কুসুমকুমার একা এদিক ওদিক বেড়াতে লাগল। কমললোচনা আড়াল থেকে তাকে দেখতে পেল। সে আশ্রয়দাতা বৃদ্ধকে বলল। সেই বৃদ্ধ কুসুমকুমারকে ডেকে আনল নিজের বাড়িতে।

কুসুমকুমার বৃদ্ধের বাড়িতে কমল-লোচনাকে দেখে তো অবাক! সমস্ত কথা জেনে সেই মুহূর্তে সে কমললোচনাকে বিয়ে করে ফেলল। সে ঐ চাকরকে তাড়িয়ে দিল। বাবা যে মেয়েকে বিয়ের জন্য ঠিক করেছিলেন তাকেও কুসুমকুমার বিয়ে করল। কারণ ঐ মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বাড়ি থেকে না বেরুলে তার সঙ্গে কমললোচনার আর দেখাও হত না কোনদিন।
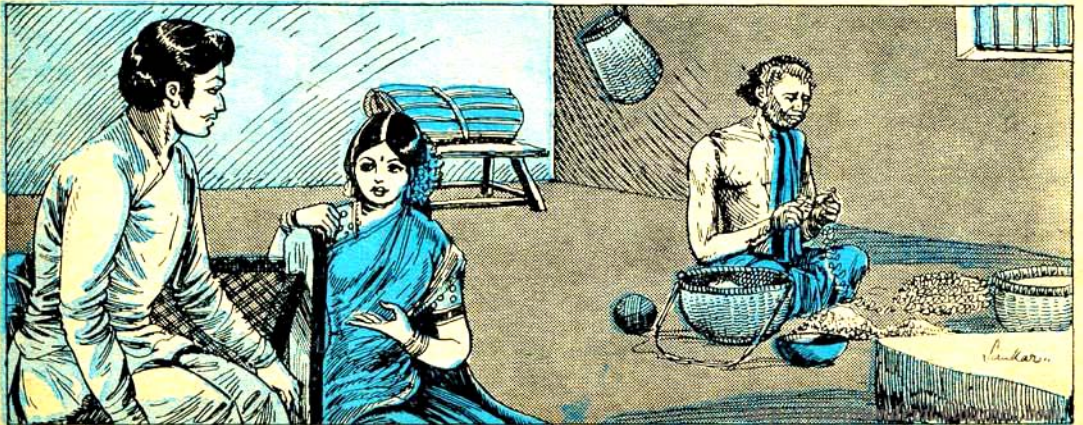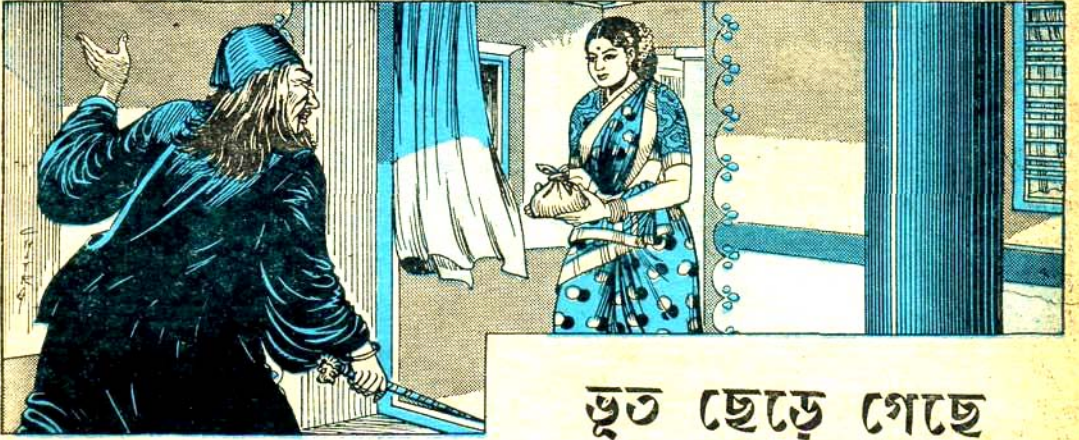
ভূত ছেড়ে গেছে

সেই গ্রামের প্রায় সবাই বোকা। এক দিন এক বেঁটে লোক এল ঐ গ্রামে। দুপুর পর্যন্ত সারা গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে শেষে এক বাড়ির সামনে এসে বসল।

সেই বাড়ির সামনে এক ফকির এসে দাঁড়াল। এক বিচিত্র কালো পোশাকে তার সমস্ত শরীর যেন ঢেকে রেখেছে। তার হাতে এক ছড়ি ছিল। ছড়ির মাথায় ছিল এক সিংহের মাথা।

ফকির ছড়ি দিয়ে ঐ বাড়ির চৌকাঠে ঠুকে হেঁকে বলল, "আরে এই বোকারা ভিক্ষে দিয়ে যা।"

পরক্ষণেই ঐ বাড়ির গিন্নী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে পোঁটলা বেঁধে ভিক্ষে এনে দিলেন ফকিরকে। ফকির সেই পোঁটলা নিয়ে চলে গেল।

ব্যাপারটা দেখে বেঁটে লোকটা অবাক হল। সে বুঝতে পারল না ফকিরকে দেখে অতবড় বাড়ির গিন্নী ভয় পেলেন কেন?"

মহিলা বেঁটে লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তুমি জাননা কেন দিলাম?"

"না, আমি আজ প্রথম এই গ্রামে এসেছি।" বেঁটে লোকটা বলল।

তারপর মহিলা ধীরে ধীরে বললেন, কি বলব বাবা, ফকিরটা আমাদের পেছনে ভূতের মত লেগে আছে। এযে কোত্থেকে এসেছে তা কেউ জানে না। ওর হাতের ছড়িটা দেখেছ তো? ঐ ছড়ি দিয়ে সে যার বাড়ির চৌকাঠে মারবে তাকে তার ইচ্ছে মত ভিক্ষে দিতে হবে। তাকে খুশি করতে হবে। ছড়ির ঘা চৌকাঠে

বি. রাণা
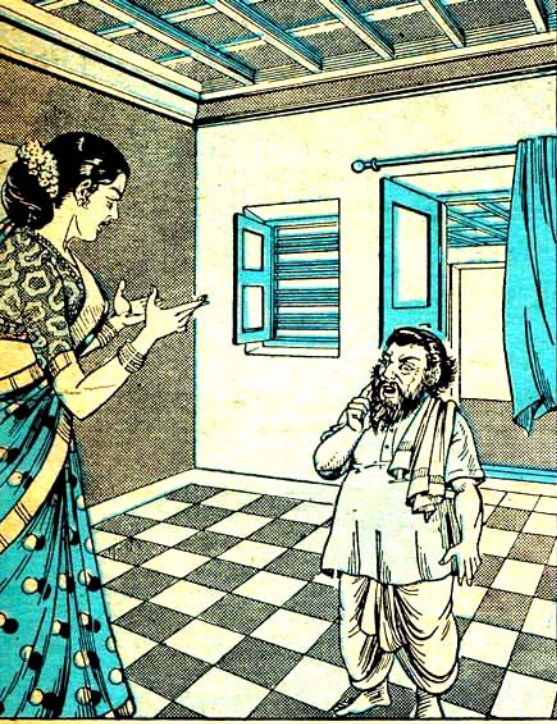
পড়তেই বাড়ির লোক সব কেমন হয়ে যায়। তাদের কোন জ্ঞান থাকে না। ফকির চলে গেলে বাড়ির লোকের ঘোর কাটে। ওর চলে যাবার পর লোকে তাকে গালাগাল দেয়। ওর ব্যবহারে প্রত্যেকেই বিরক্ত। ফকিরটা ভিক্ষে নিয়ে গাঁয়ের বাইরের বাগানে চলে যায়।"

বেঁটে লোকটা এসব কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, "লোকটা কি রোজ এইভাবে ধমকে ভিক্ষে নিয়ে আরামে থাকে ?"

"বললাম না ঐ ছড়িটা ভিক্ষে আদায়ের ছড়ি। ঐ ছড়ির ক্ষমতা খাওয়ার জন্য যতটা ভিক্ষে দরকার ততটা পাওয়া পর্যন্ত থাকে তারপর আর সেদিনের মত থাকে না। ঐ ছড়ির বলে সে ধন সম্পত্তি চাইতে পারে না।" বয়স্কা মহিলা বললেন।

গাঁয়ের কোন লোক ঐ ছড়ি কেড়ে নিতে পারে নি ?" বেঁটে লোকটা বলল।

"কি বলছ বাবা! অত সাহস কার আছে!" বয়স্কা মহিলা বললেন।

"আমি ঐ ছড়িটাকে নিতে পারি।" বেঁটে লোকটা বলল।

"বাবা, এই কথাটা আমাকে না বলে সন্ধ্যের সময় ঐ পঞ্চানন তলায় গাঁয়ের সবাই বসে পুরাণ শোনে তাদের বল।" একথা বলে মহিলা দরজা বন্ধ করল।

সেদিন সন্ধ্যায় পঞ্চানন তলায় গিয়ে বেঁটে লোকটা হাজির হল। সবাইকে ফকিরের ব্যাপারে নিজে কি ভেবেছে জানাল। কিছু-ক্ষণ গাঁয়ের লোককে আলোচনা করতে দেখে সে বলল, তবে এ কাজে আপনাদের সাহায্য দরকার। আপনাদের সাহায্য ছাড়া এ কাজ কোন ক্রমেই সম্ভব নয়।"

বেঁটের কথা কেউ শুনল কেউ শুনল না। কয়েকজন আবার তার চেহারা দেখে হাসতে লাগল। আবার কিছু লোক জিজ্ঞেস করল, "কি সাহায্য চাও ?"

বেঁটে লোকটা নিজের পরিকল্পনা ভাল ভাবে বুঝিয়ে বলে চলে গেল।

পরের দিন সকালে আম বাগানে ঘুম ভাঙ্গতেই ফকির দেখতে পেল যে অদূরে

একটা বেঁটে লোককে ঘুমোতে। ফকির প্রথমে তার দিকে তেমন গুরুত্ব দিল না। মাথার নিচে থেকে ছড়ি বের করে গাঁয়ের দিকে পা বাড়াল।

ফকিরের ভিক্ষে নিয়ে বাগানে পোঁছাতে দুপুর হয়ে গেল। সে বেঁটে লোকটার দিকে তাকিয়ে তো অবাক। তখনও সে ঝিমোচ্ছে সেখানে। তার সামনে একটা মাটির পাত্র। আর তার পাশে একটা লোহার পাতলা ছড়ি।

গাছের উপর থেকে কাক ডেকে উঠল। কাকের ডাক শুনে বেঁটে লোকটা চমকে উঠে ফকিরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর লোহার ছড়ি দিয়ে ঐ মাটির পাত্রে তিনবার ঠুকে দিল। পরক্ষণেই গাঁয়ের লোক তার কাছে আসতে লাগল। তারা নানা ধরণের খাবার এনে বেঁটে লোকটার পাত্রের কাছে রেখে দিল। তার থেকে নিজের পছন্দমত খাবার নিয়ে বাকিগুলো ফেরত নিয়ে যেতে বলল বেঁটে লোকটা।

এই দৃশ্য দেখে ফকির অবাক হয়ে গেল। তার মনে হল তার ছড়ির চেয়ে ঐ মাটির পাত্র ও ছড়ির ক্ষমতা অনেক বেশি। তাকে ঐ ছড়ি নিয়ে দুপুর রোদে বেরিয়ে লোকের বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করে আনতে হয় আর এই ছড়িওলা লোকটার কাছে গাঁয়ের লোক এসে রান্না করা খাবার দিয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যে আবার পছন্দ মত খাবার রেখে বেঁটে লোকটা খাবার ফেরত দিচ্ছে। একেবারে বসে বসে খাওয়া। আরামে শুয়ে বসে জীবন কাটানো। কী আরামের জীবন বেঁটে লোকটার।
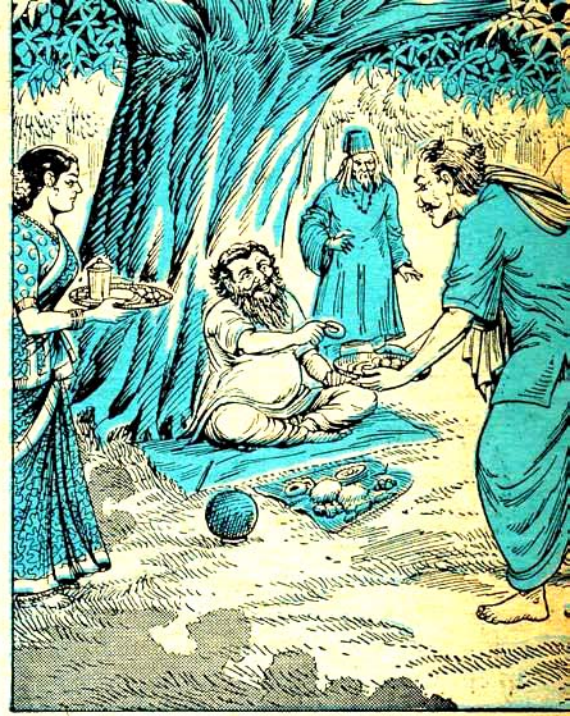
এসব ভেবে ফকির বেঁটে লোকটার কাছে গিয়ে বলল, "এই যে দাদা কেমন আছেন? কষ্ট হচ্ছে না তো? সব কুশল তো?"

"আরে দাদা, আমি নিজের ভাল মন্দের কথা আর কি বলব। আগে শুনি আপনি কেমন আছেন, কুশল তো?" বেঁটে লোকটা ফকিরকে জিজ্ঞেস করল।

"কি বলব ভায়া, বয়স তো হয়েছে আমার। এই বুড়ো বয়সে বাড়ি বাড়ি

ঘুরে ভিক্ষে করে আনা যে কি কষ্ট তা কি করে বলব।" বলতে বলতে ফকির বেঁটে লোকটার মাটির পাত্র ও ছড়ির দিকে লোভী দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিল।

বেঁটে লোকটা এ কথার কোন জবাব দিল না। সে মনে মনে ভাবল মাটির পাত্রের উপর ফকিরের বিশ্বাস তত গভীর হয়ত হয়নি। তাই সে ঐ পাত্রের বিষয়ে কোন কথা বলেনি।

সেদিন রাত্রেও বেঁটে লোকটা একই ভাবে মাটির পাত্রের গায়ে তিনবার ঠুকে খাবার আনিয়ে নিল। পছন্দমত খাবার নিল বাকিটা ফেরত দিল। ফকির আরও অবাক হয়ে বেঁটে লোকটাকে বলল, "ভায়া তুমি তো জোয়ান লোক। ইচ্ছে করলে চার বাড়ি সহজেই ঘুরে আসতে পার। আমার ছড়িটা নিয়ে তুমি তোমার এই পাত্র আর ছড়ি আমাকে দেবে ভাই? বুড়ো বয়সে আর ঘুরতে পারছি না।"

বেঁটে লোকটা কিছুক্ষণ সঙ্কোচের ভাব দেখিয়ে বলল, "অন্য কেউ চাইলে আমি দিতাম না। কিন্তু তুমি যেহেতু আমাকে ভাই ডেকেছ তাই আমি তোমাকে না দিয়ে পারব না।" বলে বেঁটে লোকটা ফকিরের কাছ থেকে ঐ ছড়িটা নিয়ে নিজের মাটির পাত্র ও ছড়ি দিয়ে দিল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর ফকির বেঁটে লোকটাকে আর দেখতে পেল না। সে দুপুর পর্যন্ত আম বাগানে শুয়ে বসে কাটিয়ে মাটির পাত্রে তিনবার ঠুকল। কিন্তু কেউ খাবার নিয়ে এল না। শেষে রেগে গিয়ে ফকির ঐ পাত্র আছড়ে ভেঙ্গে ফেলল। তার পর পেটের জ্বালায় গাঁয়ে ভিক্ষে করতে বেরুল। গাঁয়ের লোক কুকুরকে যেমন খেদিয়ে দেয় তেমনি খেদিয়ে দিল।

অবশেষে ফকির ঐ গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। তার চলে যাওয়ার খবর পেয়ে গাঁয়ের লোক খুব খুশী হল।

যক্ষপর্বত

বারো
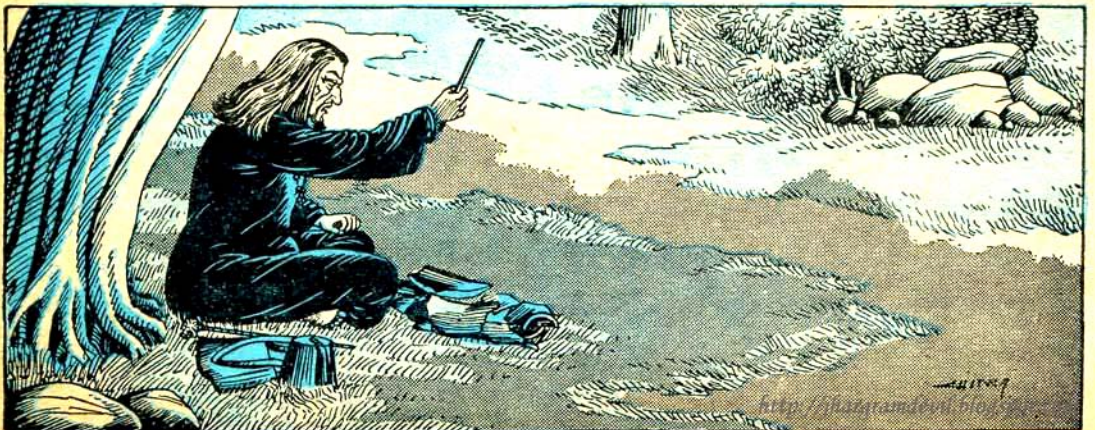
[লুণ্ঠননেতা সমরবাহুকে উদ্ধার করতে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত এগিয়ে গেল। ওরা বনে গোলামদের দিয়ে কাজ করানোর ভালুকের চামড়াধারী কয়েকজন লোককে দেখতে পেল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ওদের কাছে যেতে উদ্যত হতেই ওরা এক জায়গায় ধোঁয়া দেখতে পেয়ে সেই দিকেই এগিয়ে গেল। তারপর···]

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সেই গাছের কাছে গেল যেখানে আগুন আর ধোঁয়া দেখা গিয়েছিল। একটা গাছে উঠে ওরা দেখতে লাগল ভালুকের চামড়া পরা লোকের কাজ-কর্ম। কাছেই তারা দেখতে পেল এক বিল। ওরা শিকার করে আনা জন্তু জানোয়ারদের পোড়াচ্ছিল। কেউ আবার বাজনা বাজিয়ে ভালুক নাচিয়ে আনন্দ করতে লাগল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত যখন সেখানে পৌঁছাল তখন সেখানে সমরবাহু ছিল না। ভালুক জাতের নেতা তাকে সেই বিলের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত দুজনেই উঁচু গাছ থেকে অনুমান করল বিলে নাবার সিঁড়ি থাকতে পারে। তাদের অনুমান যে সত্য তার প্রমাণও তারা পেল।

“জীবদত্ত, এই বুনোদের বাস মনে হচ্ছে এই বিলের ভেতরেই আছে। এই বিলের ভেতর থেকে নিশ্চয়ই বনে যাওয়ার অন্য কোন রাস্তা আছে। এই লোকগুলো সমরবাহুকে পুড়িয়ে খাচ্ছে বলে আমার মনে হচ্ছে না।” খড়্গবর্মা বলল।

জীবদত্ত ঐ অঞ্চলটাকে ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখল। তারপর সে চাপা গলায় বলল, “স্বর্ণাচারি ওদের মানুষ খেকো ভেবেছে। তাই অতটা হাঁকপাক করছে। এরা বনে যেভাবে ক্ষেতের কাজ করছে তা দেখে এদের মানুষ খেকো ভাবতে পারছি না। আমার মনে হয় এরা যে সব লোককে ধরে তাদের দিয়েই ক্ষেতের কাজ কর্ম করায়। তাদের গোলাম করে খাটায়। সমরবাহু ও তার অনুচরদের এরা সুড়ঙ্গের ভেতরে নিয়ে গেছে বোধ হয়। আমি নিশ্চিত এরা মানুষ খেকো নয়।”

খড়্গবর্মাও মনে মনে এই কথাই ভাবছিল। সে গাছের অনেক উঁচু একটা ডালে উঠে বলল, “এরা শিকার করা জন্তু জানোয়ার পোড়াচ্ছে। মানুষ পোড়াচ্ছে না।”

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত যখন এই ধরণের কথা নিজেরা বলাবলি করছিল তখনই ভালুক জাতের নেতা সমরবাহু ও তার অনুচরকে নিজেদের গুরুর কাছে নিয়ে গেল। ঝুঁকে তাকে প্রণাম করে বলল, “গুরু ভালুক! এদের দুজনকে আমরা বনে পেয়েছি। এদের দেখে মনে হচ্ছে এরা বীর, সাহসী এবং লড়াই করতে পারে। এদের আমাদের অধীনে আনা, মনে হচ্ছে শক্ত হবে গুরু!”

গুরু-ভালুক গোলাকৃতি সমতলের উপর বসানো শিলার উপর বসে ছিল। সেটা ঢাকা ছিল ভালুকের চামড়ায়। আসন থেকে সামনের দিকে ঝোলানো ছিল ভালুকের মাথা। গুরু-ভালুকের দুদিকে দুটো নেকড়ে ওৎ পেতে যেন মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। বল্লম হাতে কয়েকজন ভালুক জাতের লোক এদিক ওদিকে দাঁড়িয়ে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে ছিল।

পরিবেশ এবং সকলের হাবভাব দেখে কেমন যেন লাগছিল। ভালুক জাতের লোক আর কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন সমর-বাহু ও তার অনুচরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে। ওরাও নেকড়ের পেটে যাবে ভেবে নিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ভালুক জাতের নেতার কথা শুনে গুরু-ভালুক মাথা নাড়তে নাড়তে সমরবাহুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার পোশাক দেখে মনে হচ্ছে তুমি শহুরে লোক। তুমি কোন্ উদ্দেশ্যে এই বনে এলে ?"

সমরবাহু বুঝতে পারল না এই প্রশ্নের কি জবাব দেবে। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "আমি শহরের লোক নই। সিন্ধু রেগিস্থান থেকে এই প্রদেশে এসেছি। আমার অনুচরের সংখ্যা কয়েকশো। আমাকে যে বন্দী করা হয়েছে তা আমার অনুচররা এক সময় ঠিক জানতে পারবে। তখন ওরা দল বেঁধে এই সুড়ঙ্গে ঢুকে তোমাকে আর তোমার এই সুড়ঙ্গ বাড়িটার সর্বনাশ করে ফেলবে।"

"বেশ, বেশ! তোমার গলার জোর আছে। তোমার সাহস আর পৌরুষ তারিফ করার মত।" বলতে বলতে গুরু-ভালুক জোরে হেসে উঠে বলল, "তোমার অনুচররা আমার সুড়ঙ্গে ঢোকার আগেই আমার ভালুক সেবকরা তাদের নেকড়ের পেটে পুরে দেবে। তাই বলছি, আমার সামনে বড় বড় কথা বলে বক বক করো না। আমি জানি তোমাকে আর তোমার অনুচরদের কিভাবে আমাদের অধীনে আনতে হয়। কিভাবে তোমাদের গোলাম বানিয়ে অন্য গোলামদের সাথে জুড়ে ক্ষেত খামারের কাজ করাতে হয়।"

গুরু-ভালুকের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই তার দুজন অনুচর ছুটতে ছুটতে এসে সমরবাহু ও তার অনুচরকে দেখে থ বনে দাঁড়িয়ে পড়ল। গুরু-ভালুক তাদের জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, বল ? তোমরা অমনভাবে ওদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন ?"

আগন্তুক একথা শুনে সমরবাহুর দিকে তাকিয়ে রইল। তখন গুরু-ভালুক রেগে গিয়ে বলল, "হোক গোপন কথা, বল। এরা আমাদের হাতে বন্দী। এদের কোন ক্ষমতা নেই। এদের আমি এক্ষুনি নেকড়ের আস্তানায় ছুঁড়ে দিচ্ছি।"

"গুরু-ভালুক, কথাটা যে অত্যন্ত গোপণীয়। আপনার একার এই কথা শোনা উচিত।" একথা বলে দুজনে গুরুর কাছে গিয়ে তার কানে কানে কি যেন বলল।

গুরু-ভালুক কিছুক্ষণের জন্য থ বনে বসে রইল। তারপর সমরবাহুকে যে ভালুক-নেতা ধরে এনেছিল তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "তোমার ঘটে দেখছি কিচ্ছু নেই।" কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে নীরব থেকে আবার বলল, "ভালকথা, এই দুজন বন্দীকে নেকড়ের আস্তানায় ছেড়ে দিয়ে এস। হ্যাঁ, সেখানে ছাড়ার আগে এদের বাঁধন খুলে দাও। এই দুজনের হাতে দুটো বল্লম দিয়ে দেবে।"

গুরু-ভালুকের আদেশ পেয়ে তার অনুচররা সমরবাহু ও তার অনুচরের বাঁধন খুলে দিল। ওদের হাতে বল্লম দিয়ে বলল, "এবার চল।" তারপর ওদের সুড়ঙ্গ পথে নিয়ে গেল।

ওদের যাওয়ার পরেই গুরু-ভালুক নিজের অনুচরদের দিকে ফিরে বলল, "এই নবাগতরা আমাদের সুড়ঙ্গের রহস্য হয়ত জেনে গেছে। ওদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। ওরা এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করলে তৎক্ষণাৎ ধরে আনবে আমার কাছে।"

"আজ্ঞে তাই হবে হুজুর!" বলে মাথা নত করে নমস্কার করে দশ বারজন অনুচর সুড়ঙ্গ পথে চলে গেল।

গাছের ডালে বসে সব লক্ষ্য করে খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের মনে হল, দিনের বেলা ভালুক জাতের লোকের সুড়ঙ্গের ধারে কাছে গেলে বিপদে পড়তে হবে। ভালুক জাতের লোক ভালুক নাচিয়ে শিকার করে ধরে আনা জন্তু জানোয়ার পুড়িয়ে,

পোড়া মাংস খাচ্ছিল। দুপুরের কড়া রোদে সমস্ত বন যেন তেতে ছিল। জীবদত্ত গাছ থেকে নিচে নাবতে নাবতে খড়্গবর্মাকে বলল, "খড়্গবর্মা, আমার যা দেখার, দেখা হয়ে গেছে। এখানে সময় কাটানো বৃথা। ভীষণ খিদে পেয়েছে। এখানকার কোন পুকুরে স্নান করে গাছের ফল খেয়ে কাটাতে হবে! অন্ধকার হয়ে গেলে সুড়ঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করতে হবে।"

খড়্গবর্মা জীবদত্তের কথা শুনে চুপচাপ গাছ থেকে নেবে পড়ল। দুজনে জলের সন্ধানে বেরুল। কিছুক্ষণ পরে ওরা একটা পুকুরের সন্ধান পেল। ঐ পুকুরের চার পাশে ঝোপঝাড় আর গাছপালা ভরা ছিল। জন্তু জানোয়ার যে ঐ পুকুরে এসে জল খেয়ে যায় তার চিহ্ন জীবদত্ত লক্ষ্য করল।

"খড়্গবর্মা, তাড়াতাড়ি স্নান করে এখান থেকে কেটে পড়া উচিত। মনে হচ্ছে এখানকার পশু আর ভালুক জাতের লোক এই পুকুরের জল ব্যবহার করে।" জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই ঝোপঝাড় থেকে চার পাঁচটা বুনো মুরগী ডাকতে ডাকতে সেদিকে আসছিল। ওদের দেখেই তীর ছুঁড়ে খড়্গবর্মা বলল, "অনেক দিন হয়ে গেল মুরগীর মাংস খাইনি।"

তীর সাঁ করে ছুটল কিন্তু কোন মুরগীর গায়ে তা বিদ্ধ হল না। ডাকতে ডাকতে মুরগীগুলো মুহূর্তে উড়ে গেল। পরক্ষণেই শোনা গেল মানুষের আর্তনাদ, "হে গুরু-ভালুক মরে গেলাম!"

এই আর্তনাদ শুনে মুহূর্তের জন্য খড়্গ-বর্মা ও জীবদত্ত নীরব রইল।

"খড়্গবর্মা এ এক বিচিত্র ব্যাপার তো! তোমার ছোঁড়া তীর মুরগীর গায়ে লাগল না, লাগল গিয়ে ঝোপে বসে থাকা বুনো লোকের গায়ে। কিন্তু এই গুরু-ভালুকটা আবার কে?" একথা বলে জীবদত্ত ঐ ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। খড়্গবর্মা তাকে অনুসরণ করল।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ঝোপের কাছে গিয়ে দেখতে পেল ভালুক চামড়াধারী একটা লোক রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছটপট করছে। খড়্গবর্মার তীর তার বুকে বিদ্ধ ছিল।

জীবদত্ত তার কাছে গিয়ে বলল, "তোমার পোশাক দেখেই আমরা বুঝতে পেরেছি তুমি কে? আমরা তোমাকে মারার জন্য তীর ছুঁড়িনি। আচ্ছা, তুমি ঝোপে লুকিয়ে কি করছিলে?"

বিক্ষত লোকটা জীবদত্তের কথা শুনতে পেল কিন্তু জবাব দেবার মত শক্তি সামর্থ তার ছিল না। মাটিতে গড়াতে গড়াতে বিড় বিড় করে বলছিল, "গুরু ভালুক! গুরু ভালুক!"

"জীবদত্ত, লোকটা আর মাত্র কয়েক মুহূর্ত বাঁচতে পারে। আমি বুঝতে পারছি না লোকটা মুরগী ধরার জন্য ঝোপে লুকিয়ে ছিল, না আমাদের লক্ষ্য করছিল।" খড়্গবর্মা বলল।

"তোমার প্রশ্নের জবাব যে দিতে পারে তার আত্মা এতক্ষণে বোধ হয় গুরু-ভালুকের মধ্যে মিশে গেছে।" একথা বলে জীবদত্ত পিছনের দিকে ঘুরল।

খড়্গবর্মা ভালুক জাতের লোককে ভাল ভাবে লক্ষ্য করে দেখল। বুঝল লোকটা মারা গেছে। তখন সেও জীবদত্তের সাথে

ঝোপ থেকে বেরিয়ে পুকুরের ধারে গেল। তারপর দুজনে পুকুরে স্নান করল। আশ পাশের গাছের ফল পেড়ে খেল। একটি গাছের নিচে শুয়ে তারা বিশ্রাম করল। অনুমান করল ভালুক জাতের লোক তাদের গতিবিধির উপর নজর রেখেছে। অনেক ভেবে তারা ঠিক করল ওদের হাত থেকে সমরবাহুকে মুক্ত না করে সেখান থেকে যাওয়া উচিত হবে না।

সূর্যাস্তের একটু পরে সমস্ত বনে অন্ধকার ছেয়ে গেল। তারপর সুড়ঙ্গ পথে পা বাড়াল খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত। খুব সাবধানে তারা এগোচ্ছিল। কেউ তাদের অনুসরণ করছে কিনা সেদিকেও তারা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সুড়ঙ্গের কাছে গিয়ে তারা লক্ষ্য করল সেখানে কোন পাহারাদার নেই।

"খড়্গবর্মা এখানকার ব্যাপার বুঝতে পারছ তো ? এই সুড়ঙ্গের ভালুক জাতের লোক ভাবছে ওরা আমাদের বেশ কায়দা করে বন্দী করতে পারবে। ...ব্যাটারা বুঝতে পারছে না যে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের একটা বিরাট সর্বনাশ হতে যাচ্ছে।" জীবদত্ত সুড়ঙ্গ পথে নাবতে নাবতে বলল।

খড়্গবর্মাও তাকে অনুসরণ করে সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল। ওরা এই ভাবে অন্ধকারে সিঁড়ি

ভেঙ্গে যেতে যেতে একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পোঁছাল। হঠাৎ অন্ধকার থেকে বল্লম উঁচিয়ে দশ-বার জন ভালুক জাতের লোক বেরিয়ে এসে বলল, "দাঁড়াও! আর এক পা এগিয়েছ কি তোমাদের বুকে বল্লম গেঁথে দেব।"

জীবদত্ত ওদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, তোমরা অত কষ্ট করতে যাচ্ছ কেন? সোজা নিয়ে গিয়ে নেকড়েদের খেতে দাও না। কিন্তু তার আগে একটু গুরু-ভালুকের দর্শন করিয়ে দাও।"

একথা শুনে ভালুক জাতের একজন আস্তে আস্তে বলল, "আ! অত জোরে বোলো না।" গুরু-ভালুক এখন বৃকেশ্বরীর পুজা করছেন। তোমাদের আমরা এখন নেকড়ের আস্তানায় ফেলে আসব। সেখান থেকে নিজের ক্ষমতা বলে যদি ফিরে আসতে পার তখন গুরু-ভালুকের দর্শন করিয়ে দেব।"

"ভালকথা, তাড়াতাড়ি বল, ঐ নেকড়ের আস্তানা কোথায়?" জীবদত্ত হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল।

"তাড়াহুড়ো করো না। সেখানেই যাচ্ছি।" একথা বলে ভালুক জাতের লোকেরা খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে ঘিরে নিয়ে যেতে লাগল। দূর থেকে ভেসে আসছে নেকড়ের গর্জন আর মানুষের ভয়ার্ত চিৎকার আর আর্তনাদ। সুড়ঙ্গের গায়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

"খড়্গবর্মা, এই আর্তনাদ সমরবাহু ও তার অনুচরের হবে। নেকড়েগুলো ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে কিনা কে জানে।" জীবদত্ত বলল। এই কথার জবাবে খড়্গবর্মা কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় ভালুক জাতের একজন বল্লম উঁচিয়ে বলল, "চুপচাপ চল। আর কিছুক্ষণের মধ্যে নিজের চোখেই দেখতে পাবে নেকড়েগুলো কি করছে।" (আরও আছে)

ঘুমন্ত রাক্ষস

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য আবার ঐ গাছের কাছে ফিরে এলেন। কাঁধে তুলে নিলেন শব। নীরবে এগিয়ে গেলেন শ্মশানের দিকে। তখন শবেস্থিত বেতাল বলল, "রাজা যে লোকটা তোমাকে এই কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে সে তোমার প্রশংসা করবে কি নিন্দা করবে তা বোধহয় তুমি অনুমান করতে পারছ না। সাধারণ লোকের নিজস্ব কোন মতামত থাকে না। আমার কথার প্রমাণ শঙ্কুর একটি কাহিনীর মাধ্যমে দিচ্ছি। নিজের পরিশ্রম অনেকখানি কমে যাবে এই গল্প শুনলে।

বেতাল বলতে লাগল ঃ হাজার বছর আগে গোদাবরীর তীরে একটি পাহাড়ী অঞ্চলে এক রাক্ষসী থাকত। তার শঙ্কু নামে এক ছেলে ছিল। তার বড় হওয়ার

বেতাল কথা

পর তার মা বলল, "বাবা, আমি সারাটা জীবন এই বনে কাটিয়েছি। লোকে আমার কোন ক্ষতি করেনি আর আমিও লোকের কোন ক্ষতি করিনি। আমার বয়স হয়েছে। আমি এবার তপস্যা করে শিবের মধ্যে লীন হয়ে যাব। তুমি একা বনে থেকে জীবন কাটাতে পারবে না। তাই তুমি বরং মানুষের সমাজে যাও। তাদের ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে অথবা তাদের কাছে নত হয়ে জীবন কাটাও।
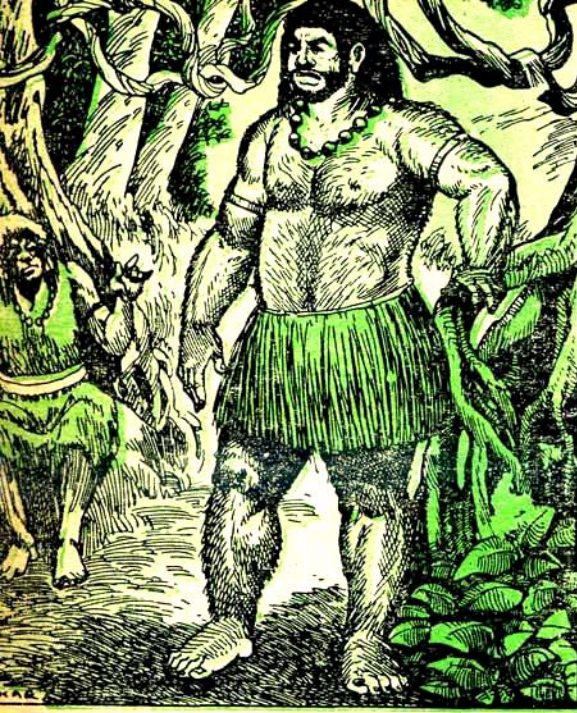
তার মার তপস্যা করতে যাওয়ার পর শঙ্কু বন থেকে বেরিয়ে এক পাহাড়ে উঠে অদূরের গ্রামের দিকে তাকাল। অনেক মানুষ সে দেখতে পেল। তার মার কথা মনে পড়ল। মানুষের মধ্যে থেকে জীবন যাপনের কথা। সে ভাবল মানুষের সাথে মেশার ব্যাপারটা পরে হবে। আগে বিশ্রাম করে নি। তারপরে সে এক গুহার ভিতর ঢুকল। সেখানে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। শঙ্কু সেখানেই পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

শঙ্কু পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে বিচিত্র ঢংএ যখন নগরের দিকে তাকাচ্ছিল তখন কিছু লোক তাকে দেখতে পেল। দেখেই 'ওরে বাবারে, রাক্ষস'! বলে চিৎকার করে ছোটাছুটি করতে লাগল। ওরা চারদিকে দৌড়ে গিয়ে খবর দিয়ে এল। ওদের কথা শুনে বহু লোক দূর থেকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ানো রাক্ষসকে দেখল।

সবাই ভাবল রাক্ষসটা একদিন ওদের উপর ঝাপিয়ে পড়বে। সবার ঘাড় মটকাবে। বহু লোককে সাবাড় করে ফেলবে। মাস ছয়েকের মধ্যে নগরে আর লোকজন বলতে কেউ থাকবে না। নগরের রাজা সবাইকে বল্লম ও তরবারি দেবেন কথা দিলেন। পাহাড় থেকে নাবার সাথে সাথে রাক্ষসটাকে হত্যা করার জন্য নানা ধরণের পন্থা লোকে ভেবে রাখল।

শুধু তাই নয়, সেদিন রাতে কেউ ঘুমোল না। ভয়ে ভয়ে কেউ ঘরে আলোও জ্বালালো না। বহু লোক সারারাত ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতে লাগল।

কিন্তু রাক্ষস নগরে এলো না। দিনের পর দিন যায় কিন্তু রাক্ষসের আর কোন পাত্তা নেই। লোকের ভয়ও কেটে যেতে থাকে। কিছু লোকের ধারণা হল রাক্ষস অন্য কোথাও চলে গেছে। যারা সাহসী তারা ক্ষেতের কাজকর্ম করতে লাগল।

তারপর বহুদিন কেটে গেল কিন্তু রাক্ষসের পাত্তা নেই। কয়েকজন সাহসী যুবক কুড়ুল, বল্লম তরবারি নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। ওরা সেখানে একটা গুহা দেখতে পেল। সেই গুহার ভিতর থেকে ভয়ঙ্কর শব্দ ভেসে আসছিল। মুহূর্তে এই খবর দাবানলের মত গোটা নগরে ছড়িয়ে পড়ল।

পণ্ডিতরা বললেন, "রাক্ষসদের শক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক বেড়ে যায়। তার ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে তাকে কেউ হারাতে পারে না।" একথা শুনে লোকের ভয় আরও বেড়ে গেল।

রাজা মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, "খবর পেয়েছি রাক্ষস গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। তাই ঘুমন্ত অবস্থাতেই রাক্ষসটাকে মারা হবে কিনা ভেবে দেখতে হবে। কারণ পণ্ডিতরা বলেছেন যে জাগার পর রাক্ষসের শরীরে ভীষণ শক্তি থাকে।"

কয়েকজন মন্ত্রী বলল, "রাক্ষসকে বাঁচিয়ে না রেখে সুযোগ পাওয়া মাত্র তাকে মেরে ফেলা উচিত।"

আমাদের শত্রু-ভয় বলতে আর কিছু থাকবে না। আমরা তাকে পুষে তার কাছ থেকে অনেক কাজ আদায় করতে পারব। ফলে আমাদের ভালই হবে।"

এই প্রস্তাব রাজা ও অন্য মন্ত্রীদের কাছে ভালই লাগল। মুখে মুখে এই কথা ছড়িয়ে পড়ল। লোকেও রাক্ষসকে মারার পরিবর্তে তাকে পোষার কথা ভাবতে লাগল। পর সে দেশে আকাল দেখা দিল।

"রাক্ষস পাহাড় থেকে নামে না কেন? সে তো নদীর পথ পরিবর্তন করতে পারে। এদিকে জল এলে চাষ আবাদ হবে। ইচ্ছে করলে পাতালের জলও সে এনে দিতে পারে। আমাদের কপালে শুধু নামেই একটা রাক্ষস আছে, কোন কম্মের নয়।" এই সব নানা কথা নগরের বুড়োরা বলাবলি করতে লাগল।

আকালের ফলে চোর ডাকাতের সংখ্যা বেড়ে গেল। প্রত্যেকদিন রাত্রে শয়ে শয়ে চোর ডাকাত যারা তাদের বাধা দিতে এগুতো তাদের প্রাণে মেরে ফেলত, এবং তরিতরকারি যা পেত তাই নিয়ে পালাত।

বুড়োরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল, ঠিক এই সময় রাক্ষসটাকে আনতে পারলে কাজের কাজ হত। যাদের সাহস আছে তারা সব জোট বেঁধে রাক্ষসটাকে জাগিয়ে, নিয়ে এস।"

কিন্তু এই পরামর্শ প্রধান মন্ত্রীর ভাল লাগল না। তিনি বললেন, "মহারাজ, আমরা সিংহ, বাঘ, মত্তহাতী প্রভৃতিকে পুষে থাকি। ওরা ভীষণ হিংস্র জানোয়ার। আমরা ইচ্ছে করলে তো রাক্ষসকে পুষতে পারি। রাক্ষস খুব জোর একশোটা মানুষের খাবার খায়। কিন্তু একটা রাক্ষস হাজারটা সৈনিকের সমান। রাক্ষস শুধু খেতে জানে। সে ধোকা দিতে জানে না। চক্রান্ত কিভাবে করতে হয় তাও সে জানে না। তাকে ঠিকমত পুষতে পারলে সে মানুষের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। তাই তাকে ঘুম থেকে জেগে উঠতে দিন, আস্তে আস্তে তাকে পোষ মানান। তারপর দেখবেন

ঘুমন্ত রাক্ষসকে জাগানো খুব বিপদের ব্যাপার। ঘুম ঘুম চোখে কি শুনবে, কি বুঝবে তারপর হয়ত যাকে সামনে পাবে তাকেই সাবাড় করে ফেলবে।" যুবকরা ভয় পেয়ে বলল।

এর এক বছর পরে শত্রুপক্ষের রাজা ঐ নগর আক্রমণ করল। এখন আর অপেক্ষা করা চলে না ভেবে কিছু যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেনাপতি পাহাড়ের উপর উঠে গেল। রাক্ষস যে গুহায় ছিল সেই গুহার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল। কিন্তু গুহার ভিতরে রাক্ষস ছিল না। কবে কোথায় সে চলে গেছে। শত্রুরাজা ঐ দেশ দখল করে নিল। দেশের লোক মনে মনে রাক্ষসকে গালাগাল দিতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "রাজা, নগরবাসী প্রথমে রাক্ষস দেখে ভয় পেল। তারপর তাকে পাবার জন্য হাঁকপাঁক করতে লাগল। তাকে না পেয়ে গালাগাল দিতে লাগল। তাহলে রাক্ষসটার ব্যাপারে লোকের মত আসলে কোনটা? লোকে কি তাকে ভালবাসত না ঘৃণা করত? এই প্রশ্নের জবাব জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

এ কথায় বিক্রমাদিত্য জবাব দিলেন, "জনতা ও রাক্ষসের মধ্যে ভালবাসার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। জনতার চোখে রাক্ষস একটা বিরাট শক্তিশালী জীব। প্রচণ্ড শক্তিধরকে কেউ ভালবাসে না। যখন বুঝবে যে তার কাছ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা আছে তখনই তারা তাঁকে দেখে ভীষণ ভয় পায়। আবার যখন বোঝে যে তার মাধ্যমে কোন উপকারের আশা আছে তখনই তারা লোভে পড়ে যায়। ঠিক সময়ে যখন কোন উপকার পায় না তখন তার নিন্দা করে।"

রাজার এই ভাবে মৌন ভাব ভঙ্গ হবার সাথে সাথে বেতাল শব নিয়ে কেটে পড়ে আবার সেই গাছে উঠে পড়ল। (কল্পিত)

মূর্খ রাজা

একবার আরবের সওদাগর ভাল জাতের ঘোড়া এনে কোশল রাজাকে দেখাল। রাজা ঘোড়া দেখে খুব খুশী হয়ে অনেক বেশি দাম দিয়ে ঘোড়াগুলোকে কিনে নিলেন। এবং আরও ঘোড়া আনার জন্য তুলাখ টাকা অগ্রিম দিলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে কথায় কথায় মজা করে রাজা তাঁর মন্ত্রীকে একশো জন মুর্খের একটা তালিকা পেশ করতে বললেন। মন্ত্রী মূর্খদের তালিকা তৈরি করে রাজার হাতে দেন। সেই তালিকায় প্রথম নাম ছিল রাজার। রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এই তালিকায় আমার নাম লেখা হল কেন?"

"মহারাজ, এক অচেনা ব্যবসায়ীকে তুলাখ টাকা অগ্রিম দেওয়ার চেয়ে বড় বোকামী আর কি আছে?" মন্ত্রী বলল।

"আর ওরা যদি ঘোড়া আনে?" রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

"তখন আপনার নাম কেটে ওদের নাম লেখা হবে।" মন্ত্রী জবাব দিল।

নিবিড় বন্ধুত্ব

এক গ্রামে গোবিন্দ ও নারায়ণ নামে দুই বন্ধু ছিল। বন্ধুত্ব সব সময় গভীর থাকত না। কখনও তাদের মধ্যে টান বেশি থাকত আবার কখনও খুব কমে যেত। ওরা দুজনেই মনে মনে চায় যে তাদের বন্ধুত্ব এক রকম থাক। কিন্তু এই এক রকম রাখার জন্য যে কি করা উচিত তা তারা বুঝে উঠতে পারছিল না। অনেক দিন এই বিষয়ে ভেবে শেষে ঠিক করল তারা ভগবানের কাছে শপথ করবে একে অন্যের কাছে কিছু গোপন করবে না।

তারা কাশী যাবে ঠিক করল। পথে খাবার জন্য গোবিন্দর বউ বানাল লুচি সুজি আর মিষ্টি। নারায়ণের বউ বানিয়ে দিল আটার রুটি ও তরকারি। দুই বন্ধুতে বেরিয়ে পড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন তারা একটা গাছের নিচে বিশ্রাম করতে লাগল। দুজনেরই খিদের চোটে পেটে ছুঁচোয় ডন মারছিল কিন্তু কেউ নিজের খাবারের পোঁটলা খোলেনি। গোবিন্দ ভাবল, নারায়ণ হয়ত শুকনো রুটি এনেছে এখন আমি ওর সামনে লুচি সুজি আর মিষ্টি বের করি কি করে। আর ওকে যদি ভাগ দেই ও হয়ত কিছু মনে করবে। আবার নারায়ণ ভাবল, গোবিন্দকে শুকনো রুটি আর আর তরকারির ভাগ দেব কি করে। ও নিশ্চয় ঘি মাখা ভাত এনেছে।

যতই খিদে পাক মুখে তারা কেউ তা প্রকাশ করল না। সন্ধ্যে হয়ে এল। তখনও তারা খেল না। রাত্রে তারা পথের ধারের এক মন্দিরের চত্বরে শুয়ে পড়ল। কিন্তু

রত্না ভদ্র

খিদের জ্বালায় কারো চোখে ঘুম নেই। গোবিন্দ ভাবে, নারায়ণ ঘুমিয়ে পড়লে সে চুপি চুপি পোঁটলা খুলে খেয়ে নেবে। নারায়ণও সেই চিন্তাতেই এপাশ ওপাশ করে রাত কাটাতে থাকে। সকালে উঠে দেখে তাদের শরীরে শক্তি নেই।

গোবিন্দ লোলুপ দৃষ্টিতে তার খাবারের পোঁটলার দিকে তাকাল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল পিঁপড়ে সারি বেঁধে তার পোঁটলা থেকে বেরিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। গোবিন্দের রাগ মুহূর্তে বেড়ে গেল। রাগে তার চোখ ঠিক্‌রে আগুন বেরুচ্ছিল।

"কি হল গোবিন্দ মনে হচ্ছে ভীষণ চটে গেছ ?" নারায়ণ জিজ্ঞেস করল।

"আমার বউটার কাণ্ড দেখ! লুচি সুজি আর মিষ্টির সঙ্গে এক কাঁড়ি পিঁপড়েও পোঁটলায় বেঁধে দিয়েছে!" বলতে বলতে গোবিন্দ পোঁটলা খুলে ফেলল। তাতে রয়েছে লক্ষ লক্ষ পিঁপড়ে।

গোবিন্দ খাবার ফেলে দিয়ে বলল, "বউটা এত পাজি আর বদমাইশ হয়েছে যে বলার নয়! একবার বাড়ি ফিরি, মজা দেখাচ্ছি। পিঠের চামড়া তুলে দেব!"

গোবিন্দের এই অবস্থা দেখে নারায়ণও তাড়াতাড়ি নিজের পোঁটলা খুলল। হায়, সেই পোঁটলা দিয়েও হাজার হাজার পিঁপড়ে বেরুতে লাগল। তা দেখে নারায়ন চোখ ছানাবড়া করে বলল, "গোবিন্দ, দেখেছ আমার বউয়ের কাণ্ড! হারামজাদী আমার সঙ্গে এরকম করল। আর যাওয়া হবে না! বাড়ি ফিরে গিয়ে আচ্ছা করে বউকে না ঠ্যাঙ্গালে শান্তি পাচ্ছি না।"

গোবিন্দও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যেতে রাজী হল। যে কথা সেই কাজ। তারা দুজনে বাড়ি ফিরে যে যার বউকে মারধোর করল। বউরা বুঝল আসল ঘটনা।

কিছুদিন পরে দুজনে আবার কাশী যাবে ঠিক করল। এবার গোবিন্দ ও নারায়ণের বউ দুজনে গোপনে বসে ঠিক করে নিল কি করবে। এবার ওরা যা করবে তাতে ওদের আর কাশী যাওয়া হবে না।

গোবিন্দ ও নারায়ণের বেরুনোর সময় দুজনের বউরা তাদের হাতে খাবারের পোঁটলা দিতে দিতে বলল, "কাশী যারা যায় তারা সারা পথে দান ধর্ম করে। শুধু তীর্থ করলে কোন ফল হয় না।

ওরা বেরিয়ে পড়ল। পথে হাঁটতে হাঁটতে দুপুরে ওরা একটা গাছের নিচে বসে যে যার পোঁটলা খুলল। দুজনের পোঁটলাতেই ডালপুরি ছিল। তবু গোবিন্দ নারায়ণকে দুটো ডালপুরি দিল আর নারায়ণও গোবিন্দকে দুটো ডালপুরি দিল।

নারায়ণের দেওয়া ডালপুরি মুখে পুরতেই গোবিন্দের মুখ যেন জ্বলে গেল। ঠিক তখনই নারায়ণ গোবিন্দের দেওয়া ডালপুরি মুখে তুলে আবার বমি করে তার সামনে ফেলে দিল।

নারায়ণের লুচিতে ঝাল অনেক বেশি পুরে দেওয়া ছিল আর নুন একেবারেই ছিল না।

আবার গোবিন্দর পুরিতে নুন ঠেসে পুরে দেওয়া ছিল আর ঝাল মোটেই দেওয়া হয় নি।

গোবিন্দ 'ঝাল ঝাল' করে চিৎকার করতে করতে নারায়ণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারায়ণও 'নুন নুন' বলতে বলতে গোবিন্দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনে যখন একে অন্যকে দমাদম্ মারছিল তখন রাস্তার লোক তাদের মারামারি থামিয়ে
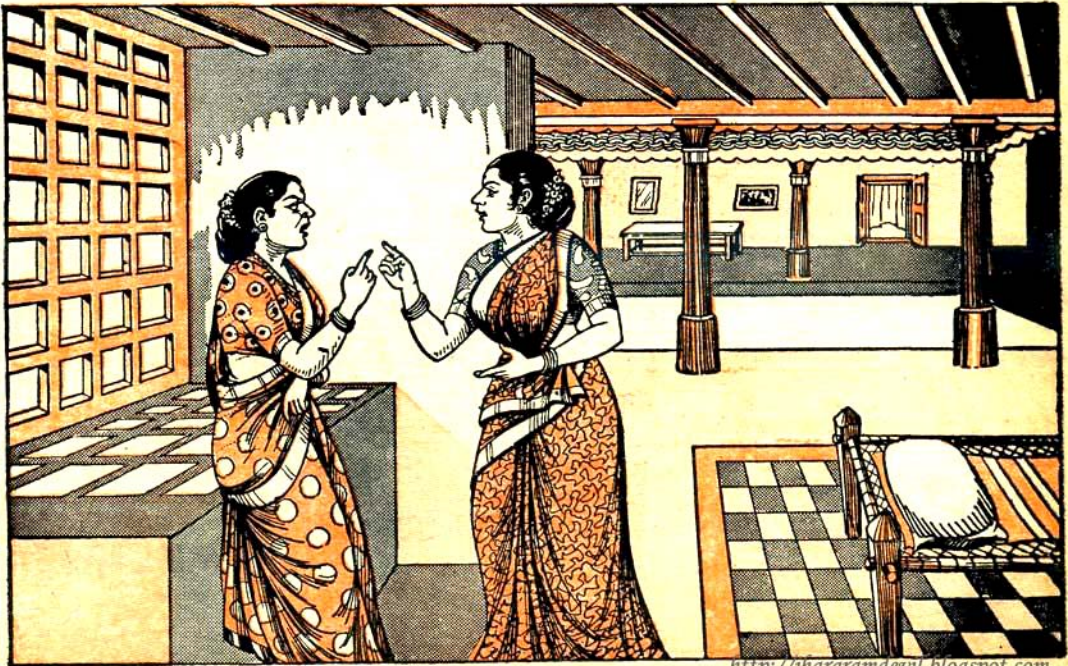
বলল, "কি ব্যাপার, তোমরা এরকম মারামারি করছ কেন ?"

"মশাই, আমরা তুজন বন্ধু। আমরা ঠিক করেছিলাম কাশী যাব। কাশী বিশ্বনাথের কাছে শপথ করব যাতে আমাদের বন্ধুত্ব আজীবন অটুট থাকে। এক রকম থাকে। তুজনে যে যার বাড়ি থেকে বউদের বানানো খাবার এনেছি। যে যার খাবার বের করে দিয়ে খেতে গিয়েই এই কাণ্ড হয়েছে। মারামারি কি আর সাধে করছি মশাই। আপনারাই একটু চেখে দেখুন না! খাবারের কি অবস্থা। মুখে দেওয়া যায় না।" গোবিন্দ ও নারায়ণ রাস্তার লোককে বলতে লাগল।

"আচ্ছা, দেখি তোমরা যে যার পোঁটলা থেকে ডালপুরি আমাদের দাও তো, আমরা খেয়ে দেখি।" ওরা এই কথা বলে ওদের তুজনের কাছ থেকে পাওয়া ডালপুরি চেখে হাসতে হাসতে বলে উঠল, "ওহে, আমরা তো এতে খারাপ কিছু দেখছি না। এই ডালপুরি তো এমন ভাবে তৈরি করা যাতে তুজনে মিলে মিলিয়ে মিশিয়ে খেতে পার। এই ভাবেইতো বন্ধুত্ব জমে উঠে। মনের মিল হয়। আর মনের মিল না হলে শুধু শুধু ঠাকুরের কাছে শপথ করে কি হবে। মনে হচ্ছে, তোমাদের চেয়ে তোমাদের বউরা অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। ওরা এই খাবার দেবার মাধ্যমে যা শিখিয়েছে তা তোমরা বুঝতে পারলে তোমাদের বন্ধুত্ব অনেক বেশি গভীর ও নিবিড় হত। এসব না বুঝে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তোমাদের কোন লাভ হবে না।"

পথিকদের কথা কান খাড়া করে শুনে গোবিন্দ ও নারায়ণ মনে মনে খুব লজ্জা পেল। এই ঘটনার পর তারা বুঝল যে কাশী যাওয়ার কোন সার্থকতা নেই। তারা বাড়ি ফিরে গেল। তার পর থেকে জীবনে কোনদিন তাদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি।

কাঠের ঘোড়া

পাঁচ

রাজকুমারী বুঝল যে বুড়োটা তাকে রাজকুমারের কাছে না নিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাচ্ছে। এত দূরে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ! কেন নিয়ে যাচ্ছে ! বুড়োকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার কর্তা তোমাকে কি বলেছে ? আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে বলেছে ? তুমি কি তোমার কর্তার নির্দেশ কত কাজ করছ ?"

বুড়ো হেসে বলল, "কে আমার কর্তা ? কামর ? সে তো বদ্ধ পাগল। একটা বালক।"

"নিজের কর্তার সম্বন্ধে এসব কথা বলতে তোমার মুখে আটকাচ্ছে না ! তোমার স্পর্ধা তো কম নয় ?" রাজকুমারী রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল।

আমি যে কে তা তুমি জান না বলেই ও কথা বলছ। কামর আমার কর্তা কোন দিনই ছিল না। হবেও না।" পার্শী শিল্পী বলল।

"তুমি যে কে তা আমি জানব কি করে ?" রাজকুমারী বলল।

তোমাকে ধোকা দেবার জন্যই আমি মিথ্যা কথা বলেছি। এই কাঠের ঘোড়াটা আমার। আমিই এটা বানিয়েছি। আমার হাত থেকে জোর করে কামর কেড়ে নিয়েছে। আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে। আমার উপর অসহ্য অত্যাচার করেছে। যাই হোক এখন আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি আমার ডেরায়। আমার কোন কিছুর অভাব নেই। তোমাকে সোনা দিয়ে মুড়ে

পার্শী তখন রেগে বলে উঠল, "ওসব ন্যাকামো ছেড়ে দাও, কান্না থামাও আর ফলগুলো খেয়ে নাও। ছেড়ে দেবার জন্যই কি আমি তোমাকে এনেছি? আমার সাথে সুখে ঘর করবে। অনেক দাস-দাসী, সাজ পোশাক, ভাল খাবার দাবার সব কিছু পাবে তুমি। তাড়াতাড়ি এখন খেয়ে নাও।"

যতই এসব কথা শুনছে রাজকুমারী ততই তার মন আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ফলগুলি সে স্পর্শও করল না। সরিয়ে রেখে শুধু কাঁদতে লাগল।

ওদের ভাগ্য ভাল। যেখানে ওরা এসে নেবেছিল সেটা তুর্কীস্তানের একটা বন।

রাখব। সোনা আর জহরতে তোমাকে ঢেকে দেব। চল আমার সঙ্গে।"

সামনেই একটা পাহাড়ী নদী। তার আশেপাশে নানা ধরণের ফল ও ফুলের গাছ। এত সুন্দর দৃশ্য দেখে যেন মনে হয় বেহস্তের এক ফালি খসে পড়েছে জমিতে। খিদে পেয়েছিল দুজনেরই খুব, পার্শী গাছ থেকে ফল পেড়ে আনল। রাজকুমারীকে দিল। নিজেও খেল পেট ভরে। কিন্তু রাজকুমারী সে ফল স্পর্শ করল না। বলল, আমার খিদে নেই। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। আর তা না হলে এ জীবন আমি আর রাখব না।" এই বলে সে কাঁদতে লাগল।

তুর্কীস্তানের বাদশাহ ঘটনাচক্রে সেদিন শিকারে এসেছিলেন। সাথে তাঁর অনেক লোকজন আর অনেক শিকারী। বাদশাহ একটু দূরে থাকতেই হঠাৎ তাঁর লোকজন শিকারের খোঁজ করতে করতে ঐ স্থানে এসে উপস্থিত হল। ওদের দুজনকে দেখেই তাঁরা থমকে দাঁড়াল। কি ব্যাপার, এই নির্জন বনের মধ্যে কদর্য চেহারার এক বুড়ো আর স্বর্গের অপ্সরার মত সুন্দরী একটি মেয়ে। সাথে রয়েছে আবলুস কাঠের ঘোড়া। এরা কোথা থেকে এল এখানে! মেয়েটি কাঁদছেই বা কেন আর বুড়ো তাকে শাসাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, এর কারণ কি?

একজন শিকারী বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল, "এ তোমার কে হয়? কাঁদছেই বা কেন?"

পার্শী উত্তরে বলল, "এ আমার খুড়তুতো বোন, আমার স্ত্রী। ও এখন মাংস রুটি খেতে চায়। ফল পেড়ে দিয়েছি তা কিছুতেই খাবে না তাই কাঁদছে। বলুনতো এই বনের মধ্যে আমি এখন রুটি মাংস কোথায় পাব?"

রাজকুমারী অনেক লোকজন দেখে মনে সাহস পেয়ে বলল, "জনাব, ও আমার কেউ নয়, কোন সম্বন্ধ নেই ওর সাথে আমার। আমি ওকে কোনদিন দেখিনি, চিনিও না। ও জাদু-ঘোড়ায় চাপিয়ে আমাকে চুরি করে এনেছে। আমাকে ছেড়ে দিতে বলছি, তাও ছাড়বে না। বলছে আমাকে ও বিয়ে করবে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও জানি না। তাই আমি অজানা আশঙ্কায় কাঁদছি।"

এ সব কথা হতে না হতেই বাদশাহের আরও লোকজন সেখানে হাজির হল। শিকারীরা তাদের বলল, "এদের দুজনকেই বাদশাহের কাছে নিয়ে চল। বাদশাহই বিচার করবেন এদের।"

শিকারীদের মুখে সব শুনে বাদশাহও অনেক প্রশ্ন করলেন পার্শীকে।

কিন্তু জবাবে পার্শী যা বলল বাদশাহ তার এক বর্ণও বিশ্বাস করলেন না। বরং
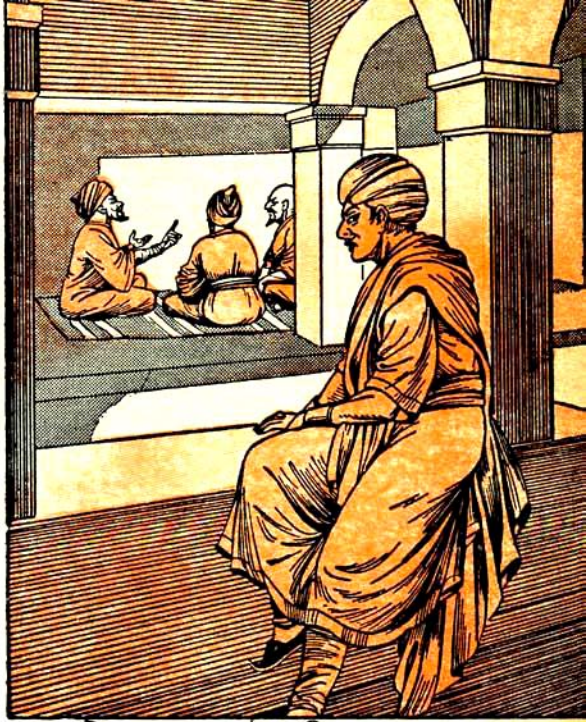
মেয়েটি যা বলল তাই সত্যি বলে মনে হল। বাদশাহ তখন আদেশ দিলেন বুড়োটাকে বেশ কয়েক ঘা বেত লাগিয়ে কারাগারে নিয়ে যেতে ও ঐ ঘোড়াটাকে কোষাগারে রাখতে। বাদশাহের সেপাইরা পার্শী বুড়োকে মেরে মেরে আধমরা করে দিল। তারপর তাকে কয়েদ ঘরে ফেলে রাখল। বাদশাহ হুকুম দিলেন ঐ সুন্দরী মেয়েটাকে রাজকীয় সম্মানে রাজার প্রাসাদের অন্দর-মহলে নিয়ে যেতে। পরে সব বিচার করা হবে। পার্শী দুষমনের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে রাজপ্রাসাদে আশ্রয় পেয়ে রাজকুমারী যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ঈশ্বর বুঝি এবার মুখ তুলে তাকালেন।

এদিকে কামর-অল-আকমর রাজকুমারীর সন্ধানে ফকিরের বেশে নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যেখানে যাচ্ছে, সেখানেই লোকদের জিজ্ঞেস করছে, একটা লোককে ঘোড়ায় চড়ে একটা সুন্দর মেয়েকে নিয়ে যেতে দেখেছ কেউ ? সবাই বলছে না তারা দেখেনি। আর রাজকুমারের জিজ্ঞাসা ও চাল চলন দেখে সবাই ভাবে লোকটা একটা পাগল। কামরের মনে শুধু একই চিন্তা। রাজকুমারীকে উদ্ধারের চিন্তা। দিনের পর দিন অবিরাম পথ চলতে লাগল। দেশ থেকে দেশান্তরে রাজকুমারীর খোঁজ করে বেড়াতে লাগল। কিন্তু কোথাও খোঁজ পেল না রাজকুমারীর। কামর শেষে এল সানাতে। সেখানেও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আবার পথ চলতে শুরু করল সে। হাঁটতে হাঁটতে এসে হাজির হল তুর্কীস্তানের সীমায়। সেখানে এক ধর্ম-শালায় উঠল। সেখানে কয়েকজন ব্যবসাদার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল। শুনল কয়েকজন খাবার খেতে খেতে গল্প করছে। তাদের মধ্যে একজন বলছে, "কাল টাকা আদায়ের জন্য তুর্কীস্তানে গিয়েছিলাম। ওখানে এক অদ্ভুত খবর শুনলাম। সবারই মুখে এক কথা। কিছুদিন আগে নাকি বাদশাহ গিয়েছিলেন শিকারে। তাঁর লোকজন শিকারের খোঁজে এদিক ওদিক করতে করতে এক নদীর ধারে গাছতলায় দেখে, এক বুড়ো আর একটি পরীর মত মেয়ে বসে রয়েছে। মেয়েটি কাঁদছে আর বুড়ো তাকে শাসাচ্ছে। তাদের পাশে ছিল সুন্দর কাঠের এক ঘোড়া। ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে তারা ঘোড়া সহ তুজনকেই বাদশাহের কাছে নিয়ে যায়।

কামর নিশ্বাস বন্ধ করে যেন সব কথা শুনল। ঐ পর্যন্ত শুনেই কামর বুঝতে পারল এ সেই রাজকুমারী। সে পরদিনই তুর্কীস্তানে যাত্রা করল। সমস্ত দিন হাঁটার পর সে রাজধানীর কাছে গিয়ে হাজির হল। শহরে ঢুকবে এমন সময় এক প্রহরী তাকে বাধা দিল। বলল, "তুমি

যাচ্ছ কোথায় ? কি দরকার, কোথা থেকে এলে ?"

রাজকুমার বলল, "আমি বৈদ্য দরবেশ। এসেছি অনেক দূর থেকে। দেশে দেশে ঘুরে বিনা দক্ষিণায় রোগ সারানোই আমার ব্রত। রোগ সারলে খুশী হয়ে যে যা জোর করে দেয় বাধ্য হয়ে নিয়ে থাকি। আগে রোগ সারানোই আমার কাজ।"

প্রহরীরা রাজকুমারের চেহারা ও কথা-বার্তা শুনে বুঝল যে এ একজন খুব বড় ঘরের ছেলে। তাই কারাগারে না পাঠিয়ে তাকে নিজেদের কাছেই রাখল। তারপর খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করল।

পরের দিন সকালে দরবারে বাদশাহের সামনে কামর-অল-আকমরকে হাজির করল।

কামর বাদশাহকে কুর্ণিশ করে দাঁড়াল। তখন বাদশাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি ? তোমার দেশ কোথায় ? কেন এখানে এসেছ ?"

রাজকুমার উত্তরে বলল, "আমি বৈদ্য দরবেশ। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আর লোকের রোগ সারানোই আমার কাজ। বিশেষভাবে উন্মাদ রোগ, জিন পরীতে পাওয়ায় দরুণ যারা পাগল, তাদের সারানোর মন্ত্র তন্ত্রও জানি আমি। যত জটিল রোগই হোক না কেন আমি সহজেই সারাতে পারি। রোগ সারানোই আমার জীবনের ব্রত। রুগীকে রোগ মুক্ত করাই আমার মূল লক্ষ্য। আমার দেশ অনেক দূরে। পারস্যে।"

এই সব কথা শুনে বাদশাহ খুব খুশী হলেন। বললেন, "আমার প্রাসাদে এক রোগিণী আছে। সে কেবল হাসে কাঁদে আর বুক চাপড়ায়। লোক দেখলে তাদের কামড়াতে আসে। তাকে পারবে তুমি ভাল করতে ?"

দরবেশ শুনে বলল, "মনে হচ্ছে পারব। মনে হয় ওকে জিনে পেয়েছে। একবার দেখলে বুঝতে পারব।"

তাহলে এস আমার সাথে। এই বলে বাদশাহ কামরকে নিয়ে গেলেন অন্দর

মহলে একে বারে রাজকুমারীর ঘরে। বাদশাহ আর কামরকে দেখেই রাজকুমারী ছুটে এল তাঁদের কামড়াতে। পাগল হলেও কামর দেখেই চিনতে পারল এ সেই রাজকুমারী। তখনই সে বাদশাহকে ইঙ্গিতে বাইরে ডেকে এনে বলল, "হুজুর, একে আমি ভাল করতে পারব। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। একে জিনে ধরেছে।"

বাদশাহ খুব খুশী হয়ে বললেন, "যদি সারাতে পার তাহলে তুমি যা চাইবে তাই পাবে। দেখ একটু চেষ্টা করে।"

কামর বলল, "আজ এই মুহূর্তে আমি ঝাড়ফুঁক করে ওর অর্দ্ধেক রোগ ভাল করে দিচ্ছি। কিন্তু আমার ঝাড়ফুঁক করার সময় আপনি ঘরে থাকবেন না। আমি ছাড়া অন্য কেউ ঘরে থাকলে জিন দেখা দেবে না।"

বাদশাহ বললেন, "বেশ তাই হবে। আমি কাছে থাকলে তোমার রোগ সারাতে যদি অসুবিধা হয় তবে আমি দূরেই অপেক্ষা করছি। যে কোন ভাবে এই পরমা সুন্দরীকে রোগমুক্ত করে তোল। আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি।"

কামর রাজকুমারীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই সে রাজকুমারকে চিৎকার করে কামড়াতে এল। তক্ষুনি রাজকুমার তার হাত ধরল এবং কানে কানে বলল,

"দেখ একবার ভাল করে, কে আমি। আমি তোমার সেই রাজকুমার।"

রাজকুমারী এবার ভাল করে তাকিয়েই চিনতে পারল কামরকে। তার চিৎকার থেমে গেল। দুচোখ জলে ভরে গেল। বলল, "তুমি এসেছ? আল্লাহ এতদিনে মুখ তুলে তাকিয়েছেন।"

রাজকুমার বলল, "মনে হচ্ছে তাই। কিন্তু আস্তে কথা বল। যা বলছি তা ঠিক ঠিক ভাবে করে যাও। তাহলে হয়তো পারবো তোমায় উদ্ধার করতে।"

"তাড়াতাড়ি বলো আমায়, কি করবো। আমার আর দেরি সইছে না।" রাজকুমারী তাকে বলল।

"আজ চান করবে ভাল করে, খাওয়া দাওয়া করবে, চুল বাঁধবে, কাজল পরবে চোখে, ভাল করে সাজবে। তারপর যখন সন্ধ্যায় বাদশাহ আসবেন তখন তুমি তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসাবে। বাদশাহ দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। বেশী দেরি করা ঠিক হবে না। আজ যেভাবে বললাম সেভাবে কাজ কর। তারপর যা করতে হবে পরে বলে দেব।" এই বলে কামর বুকে রাজকুমারীকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ চেপে গম্ভীরভাবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অভ্যাস মত সন্ধ্যায় বাদশাহ রাজ-কুমারীকে দেখতে এলেন। দেখে অবাক। সে অনেক বদলে গেছে। আজ আর

তাঁকে তাড়া করল না, মারতে এল না, চুল ছিঁড়ল না। বুক চাপড়েও কাঁদতে বসল না। পরিবর্তে তাঁকে অভ্যর্থনা করে বসাল। কুশল জিজ্ঞাসা করল।

বাদশাহ কিছুক্ষণ রাজকুমারীর সাথে কথাবার্তা বললেন। কিন্তু শেষের দিকে রাজকুমারী কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে উপরের দিকে তাকাচ্ছিল আর ভয়ে আঁৎকে উঠছিল।

বাদশাহ আর দেরি না করে উঠে পড়লেন। অনেকটা সুস্থ হবে বৈদ্য বলেছিল। বাইরে এসে তিনি বৈদ্যকে ডেকে পাঠালেন। বৈদ্য এলে তাকে কিছুটা আনন্দ প্রকাশ করে সব কথা বললেন।

শুনে বৈদ্য বলল, "ঠিক আছে হুজুর, কাল আর একবার ঝাড়ফুঁক করব। পরশু দিন একটা বড় ধরণের ব্যাপার করতে হবে। তা ঠিক ভাবে করতে পারলে রোগিণী সম্পূর্ণ ভাল হয়ে যাবে।"

বাদশাহ কামরকে একশো মোহর পুরস্কার দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, "কি কি জিনিস চাই তোমার বল? আর কি কি করতে হবে বল?"

কামর বলল, "যেখান থেকে ওকে আনা হয়েছিল, সেখানে নিয়ে যেতে হবে, সাথে থাকবে ঐ কাঠের ঘোড়া। কারণ জিনটা ওখানেই এঁকে ধরেছে। তাই ওখানে গিয়েই তাড়াতে হবে। না হলে তাড়ানো যাবে না।"

সেদিন সকালে বৈদ্যের কথানুযায়ী সব জিনিস এসে গেল। বৈদ্যের কথামত রোগিণীকে নিয়ে যাওয়া হল সেই বনে। চতুর্দোলায় করে রাজকন্যাকে আর ধরাধরি করে কাঠের ঘোড়াটাও নিয়ে যাওয়া হল বনের সেই যায়গায়। প্রকাণ্ড বড় একটা কি যেন তীরের মত আকাশে উড়ে গেল। লোকজন সব চিৎকার করে উঠল, "ঘোড়া, ঘোড়া।"

বাদশাহ এই ব্যাপার দেখে প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন। কারণ প্রকাণ্ড জিনিসটা যে হুস্ করে হাওইয়ের মত উপরে উঠে

গেল তা চট করে বুঝে উঠতে পারেন নি। আর এখন বুঝবারও উপায় নেই। কারণ এত উপরে উঠে পাখীর মত ছোট হয়ে মিলিয়ে গেল যে তা আর দেখাও গেল না।

আর একটু পরেই ফিরবে ভেবে বাদশাহ দুপুর পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর ধারণা ছিল বৈদ্য রাজকুমারীর রোগ সারাবার জন্যই উপরে উঠে গেছে। আবার ঠিক নাববে। পার্শ্বচরদের কথায় বাদশাহ ফিরে গেলেন প্রাসাদে। সারাদিন অপেক্ষা করলেন। কিন্তু বৈদ্য আর এল না রাজকুমারীকে নিয়ে।

বাদশাহ তখন ভয়নক রেগে গিয়ে পার্শী বুড়োটাকে ডেকে বললেন, "পাজী বদমাইশ, তুমি কেন আমাকে জানালে না যে ঘোড়াটা উড়তে পারে? জবাব দাও? এই কে আছিস এখানে? এই বুড়োটার গর্দান নে। বাদশাহের নির্দেশে বুড়োর গর্দান নেওয়া হল।

মনের আনন্দে রাজকুমার ঘোড়া ছোটালো। কামর রাজকুমারীকে নিয়ে এল পারশ্যের সিরাজ শহরে নিজের বাড়িতে। রাজবাড়িতে আবার আনন্দের ঢেউ। এবার দেরি না করে সাবুর পরের দিনই রাজকুমারের সাথে রাজকুমারীর বিয়ে দিলেন। এক মাস পর্যন্ত বিয়ের উৎসব চলল।

সাবুর কিন্তু ঘোড়াটা আর রাখেন নি। ছেলের বিয়ের পরদিনই ওটা ভেঙ্গে ফেলে ছিলেন।

কামর পরের দিনই সানায় একটা চিঠি পাঠাল। সেই চিঠিতে সবিস্তারে সব জানাল। বিশেষ দূতের মাধ্যমে ঐ চিঠি পাঠানো হল। আর তার সাথে অনেক উপহারও দূতের হাত দিয়ে পাঠাল তার শ্বশুরের কাছে।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে বাদশাহ সাবুরের মৃত্যু হল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কামর সিংহাসনে বসল।

কৃপণ

এক গ্রামে ছিল এক ধনী। লোকটা হাড় কেপ্পন। ভাল খেত না, পরত না।

উৎসবের দিন। বাড়ির চাকর আর থাকতে না পেরে তার মনিবকে বলল, "কর্তাবাবু, আজ উৎসবের দিন। পুরোনো কাপড় কেন পরেছেন? নতুন জামা কাপড় পরলেই তো পারেন। আপনার অভাব কিসের?"

"ওরে, চেনা বামুনের পৈতা লাগে? কে না চেনে আমাকে। আমার কাছে নতুন পুরোনো সব সমান।" ধনী লোকটা জবাব দিল।

চাকর কিছু বলল না। মনে মনে ভাবল তার মনিব সত্যিই হাড় কেপ্পন লোক।

কিছুদিন পরে ধনী লোকটা পাশের গ্রামে যাওয়ার আগে চাকরকে বলল, "আমি একটু বেরোচ্ছি। বাড়ির উপর নজর রাখিস। খুব সাবধান।"

"কর্তাবাবু, ভিন্ গেরামে ছেঁড়া জামা কাপড় পরে যাচ্ছেন? চাকর বলল।"

"ওরে পাগল, অন্য গ্রামের লোক কি আর আমাকে চেনে যে নতুন জামা কাপড় পরে যাব। এতেই চলবে।" ধনী কিপটে লোকটা বলল।

চন্দ্রভানু

ক্ষত্রপুরে রাজা উদয়ভানু রাজত্ব করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল রূপমতী। ঐ দম্পতির অনেক কাল ধরে কোন সন্তান ছিল না। সন্তান যাতে হয় তার জন্য নানান মন্দিরে পূজো দিলেন। সাধুসন্যাসী খোঁজ করে তাঁদের সেবা দিলেন। কিন্তু কোন ফল হল না।

শেষ পর্যন্ত নিরুপায় হয়ে এক পরমা-সুন্দরীকে বিয়ে করলেন। তাঁর নাম লাবণ্য। বিয়ে যখন করেন তখন উদয়ভানুর বয়স চল্লিশ। রাজা সর্বক্ষণ লাবণ্যের কাছেই কাটাতেন। বড় বউয়ের কাছে মাসে খুব জোর দু-তিন দিন থাকতেন।

বিয়ের পর দুবছর কেটে গেল। কিন্তু লাবণ্যের গর্ভে কোনো সন্তান হল না। এর মধ্যে বড় রাণী কোন্ শেকড় বাকল খেয়ে জননী হওয়ার চেষ্টা করে সফল হল। তাঁর গর্ভে একটি সুন্দর সন্তান জন্মগ্রহন করল। শিশুর নাম রাখা হল চন্দ্রভানু। রূপমতী ভাবল এবার তার দিন ফিরেছে।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। কারণ ইতিমধ্যে লাবণ্য রাজাকে একেবারে বশীভূত করে ফেলেছিল। লাবণ্য যা বলতেন রাজা মাথা নিচু করে তা পালন করে যেতেন। ছোট রাণীর কোন কথারই বিরুদ্ধতা তিনি করতে পারতেন না।

রূপমতীকে লাবণ্য মোটেই দেখতে পারত না। তাই সে রাজাকে বোঝাল, রূপমতী কোন তুক্‌তাকের সাহায্যে গর্ভবতী হয়েছে। এই ধরণের কাণ্ড করে যে ছেলের জন্ম হয় সে ছেলে রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মারাত্মক হয়। ফলে যে রাজা রূপমতীর

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

গর্ভে সন্তান যাতে আসে তার জন্য জপতপ করলেন, মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিলেন তিনিই আবার পরে চন্দ্রভানুকে গোপনে বনে রেখে আসতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আট মাসের শিশু চন্দ্রভানুকে বনে ফেলে আসার ভার রাজা সৎকাল নামক একজনকে দিলেন। সৎকাল চন্দ্রভানুকে নিয়ে গোপনে বনের দিকে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু সে বনে না গিয়ে সে গেল পাশের রাজ্যে তার এক জাদুকর বন্ধুর কাছে। নাম তার জাদুপতি। ঐ রাজ্যের নাম সাতপুরি। সব কথা শুনে চন্দ্রভানুকে লালন পালন করার দায়িত্ব নিল।

দিনের পর মাস, মাসের পর বছর কেটে গেল। উদয়ভানুর কপালে আর কোন সন্তানের আবির্ভাব ঘটল না। লাবণ্য মা হতে পারল না। পরে লাবণ্যের উপদেশ মত রাজা লাবণ্যর ভাইপোকে পোষ্যপুত্র হিসেবে গ্রহণ করলেন।

উদয়ভানুর বয়স বাড়তে লাগল। কিন্তু তাঁর টান লাবণ্যের প্রতি একটুও কমেনি। আস্তে আস্তে এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লাবণ্য রাজার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি দেখতে লাগলেন। লাবণ্যর নির্দেশে বড় রাণী রূপমতীকে এক সাধারণ মহিলার মত জীবন যাপন করতে হত। তাঁকে থাকতে হত একটি অতি সাধারণ ঘরে। দাসীর জীবন কাটাতে হচ্ছিল তাঁকে। ঘরে বাইরে লাবণ্যর নিষ্ঠুর আচরণের ফল দেশবাসীর উপর গিয়ে পড়তে লাগল। প্রজাদের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠল।

হঠাৎ একদিন লাবণ্য রাজার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তাঁর নামে লিখে দিতে বললেন। রাজা বেঁচে থাকতেই এভাবে দাবি করাতে তাঁর চোখ ফুটল। তিনি বুঝতে পারলেন ছোটরাণী লাবণ্যর আসল মতলব। তিনি বুঝলেন যে তিনি ভুল পথে চলেছেন। কিন্তু বুঝেও কিছু করার ছিল না তাঁর। যা করার অনেক আগেই করা উচিত ছিল। ফলে রাজাকে ছোটরাণীর কথা মতই কাজ করতে হল। রাজ্যের সমস্ত ভার লাবণ্যকে দিতে হল।

এই ভাবে কয়েক বছর কাটার পর রাজা উদয়ভানু ও বড়রাণী রূপমতী এক জায়গায় সাধারণ মানুষের মত থাকতে লাগলেন। ওঁরা যেন আবার নিজেদের খুঁজে পেলেন। রাজা চন্দ্রভানুকে বনে পাঠিয়েছিলেন ভেবে অনুতপ্ত হতে লাগলেন। রূপমতী সেই দরিদ্র অবস্থায় থেকে রাজার সেবা করতে লাগলেন। চন্দ্রভানুর জন্মের ষোল বছর পরে রূপমতী আবার এক কন্যার জননী হলেন। ওদিকে চন্দ্রভানু জাদুকরের সঙ্গে থেকে থেকে অনেক জাদুবিদ্যা শিখে নিল। দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি সে বলবান।

একদিন এক শুভ মুহূর্তে চন্দ্রভানু জাদুপতিক সঙ্গে নিয়ে লাবণ্যের দরবারে হাজির হল। বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল, "আমিই চন্দ্রভানু, এই রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী।

লাবণ্য অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "তুমি বাজে কথা বলার জায়গা পাওনি? চন্দ্রভানু কোন্ কালে বনের জন্তু-জানোয়ারদের পেটে গেছে। যাও ভাগ এখান থেকে, তা না হলে গর্দান যাবে।"

"আমি একবার রাজাকে দর্শন করতে চাই।" চন্দ্রভানু বলল।

"রাজা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি শয্যা-শায়ী। উনি দরবারে আসতে পারেন না।" লাবণ্য জবাবে বলল।
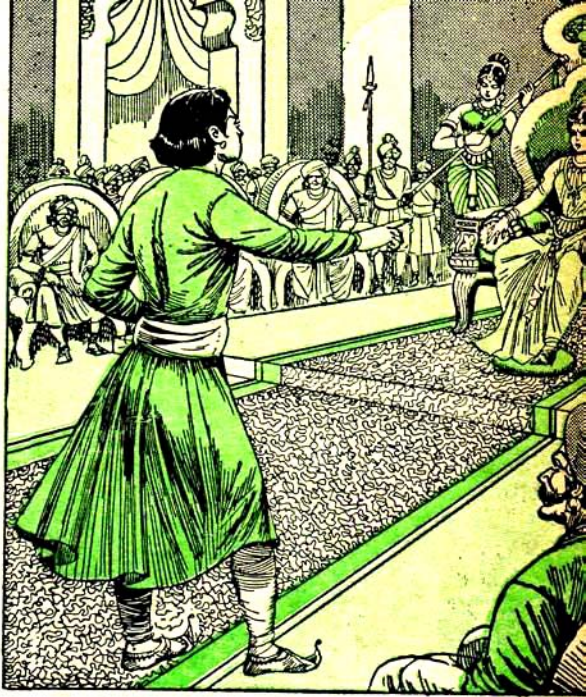
"আমি আমার মাকে দেখতে চাই। তাঁর কাছে যেতে চাই।" চন্দ্রভানু বলল।

"তোমার মা এখানে ছিল? মিথ্যা পরিচয় দিয়ে আসতে কে বলেছে? এক্ষুনি চলে যাও তা না হলে তোমার ফাঁসি হয়ে যাবে।" রাণী লাবণ্য ধমক দিয়ে সেপাইদের ইশারায় তাকে বন্দী করতে বলতেই সে তীব্র গতিতে বেরিয়ে গেল।

সেই রাজ্যের মানুষ লাবণ্যের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে উঠল। রাজা উদয়ভানু বা তাঁর পোষ্যপুত্রের প্রতিও দেশবাসীর কোন আস্থা ছিল না। এই অবস্থায় দরবারে চন্দ্রভানুর বজ্র ঘোষণা, উদয়ভানুর উত্তরা-ধিকারী হিসেবে সিংহাসন দাবি প্রভৃতি

বিষয় দাবানলের মত দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। লোকের মনে কোন এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার আশা দেখা দিল।

চন্দ্রভানুও ইতিমধ্যে রাজধানীর বিভিন্ন লোকের সঙ্গে দেখা করে সমস্ত বিষয় বিস্তারিত ভাবে তাদের জানালো। ওরা চন্দ্রভানুকে বলল, "যুবরাজ, তুমি আমাদের এই দুষ্ট রাণীর হাত থেকে বাঁচাও। আমরা তোমায় সাহায্য করব।"

দেশের মানুষকে জড় করে চন্দ্রভানু পরের দিন দরবারে পৌঁছাল। চন্দ্র-ভানুকে যে পোশাকে বনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই পোশাকও সে সঙ্গে নিল। দেশবাসীর সামনে লাবণ্যকে ঐ পোশাক দেখিয়ে বলল, "এই পোশাক চিনতে পারেন? এই পোশাকেই তো আমাকে বনে পাঠানো হয়েছিল!"

"ঐ শিশুকে হয়ত পশুর মুখে ঠেলে দিয়ে তোমরা চক্রান্ত করে এই পোশাক নিয়ে হাজির হয়েছ।" লাবণ্য বললেন।

বৃদ্ধেরা একথা শুনে বললেন, "নিজের মা-বাবা তো নিশ্চয় চন্দ্রভানুকে চিনতে পারবেন। তাঁদের কাছে পাঠান একে।"

রাজা উদয়ভানু ও রূপমতী অপলক চোখে তাকিয়েও চন্দ্রভানুকে চিনতে পারলেন না। তার পর সুযোগ বুঝে লাবণ্য চন্দ্রভানুকে বললেন, "ওরে বিশ্বাস-ঘাতক তোর আসল রূপ ধরা পড়েছে। এবার তোকে মৃত্যুদণ্ড দেব।"

তখনই অদূর থেকে জাদুপতি বলে উঠলেন, সঠিক মা এবং সন্তানকে চেনার একটা উপায় আছে। অত তাড়াহুড়ো করে ফাঁসির হুকুম না দিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। মার বুকের দুধ পুকুরের এক প্রান্তে জলে ঢেলে অন্য প্রান্ত থেকে ছেলে এক ঘড়া জল তুলুক। ওরা যদি সত্যি সত্যি মা ও ছেলে হয় তাহলে ঘড়ার জল দুধ হয়ে যাবে। অতএব, আপনি রাণী রূপমতী ও চন্দ্রভানুকে একটি পুকুরের দুই প্রান্তে পাঠিয়ে পরীক্ষা করে দেখুন।"

লাবণ্য ভাবলেন, জাতুপতি যা বলছেন তা কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। তিনি বললেন, "পরীক্ষা হোক। কিন্তু পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে সঙ্গে সঙ্গে এই ছেলে-টিকে ফাঁসি দেওয়া হবে।

"তার জন্য আমি প্রস্তুত আছি।" চন্দ্রভানু যেন বুক ঠুকে জবাব দিল।

ঠিক হল দুদিন পরে রাজপ্রাসাদের কাছে যে পুকুর আছে তাতেই পরীক্ষা করা হবে।

পরীক্ষার দিনে পুকুরের চারদিকে হাজার হাজার মানুষ জমা হয়ে গেল। সকলের মনে এক প্রশ্ন, কি হবে? তার পর জাতুপতির কথা মত সব হল। রূপমতী পুকুরের এক প্রান্তে দুধ ঢাললেন আর অন্য প্রান্তের জল ঘড়া করে চন্দ্রভানু তুললেন। সবাই অবাক হয়ে দেখল যে ঘড়ায় জল নেই। আছে শুধু দুধ! সমবেতদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার এল যেন। বৃদ্ধরা এগিয়ে এসে বললেন লাবণ্য-কে, "পরীক্ষাতো হল। এখন তো আর কোন সন্দেহ রইল না। অতএব, আর কাল বিলম্ব না করে চন্দ্রভানুকে সিংহাসনে বসান। আপনি নাবুন সিংহাসন থেকে।"

লাবণ্য মাথা নীচু করে সিংহাসন থেকে নাবল। চন্দ্রভানুর ঘড়ার জল কিভাবে সাদা হয়ে গেল বলব? একটি পরিষ্কার সাদা কাপড়ের টুকরোকে চন্দ্রভানু আগে বারো বার দুধে ডুবিয়ে বারো বার শুকোতে দিল। জলে নেমে ঘড়ায় করে জল তুলে তাতে ঐ ন্যাকড়া ঢুকিয়ে ভাল ভাবে নাড়ল চন্দ্রভানু। পরে কায়দা করে ঐ ন্যাকড়া বের করে পায়ের নিচের মাটিতে ঢুকিয়ে দিল। তার পর ঐ ঘড়া ভর্তি সাদা জল নিয়ে পুকুর থেকে উঠল।

পুকুরের চারদিকে যারা ছিল তারা ঐ সাদা জলকেই দুধ ভেবে আনন্দ মুখর হয়ে উঠল।

কুকুরের ব্যবসা

পাঁচশো বছর আগে হাঙ্গেরীতে মাত্যাস নামে এক ধর্মাত্মা রাজা শাসন করতেন। সেই সময়ে রাজধানীর অল্প দূরের এক গ্রামে এক ধনী বাস করত। অন্যদের সরলতার সুযোগ নিয়ে ঠকানো তার প্রায় জন্মগত অধিকারে দাঁড়িয়ে গিয়ে ছিল। এমন কি আত্মীয় স্বজনদেরও সে ঠকাতে ছাড়ত না। ওরা সহজে তার কথায় চলতে গিয়ে ভীষণভাবে ঠকে যেত। কাউকে ঠিক মত ঠকাতে পারলে তার দারুণ আনন্দ হত। এক কথায় ঠকানোই ছিল তার পেশা এবং নেশা।

একবার সেই ধনী লোকটা রাজধানীতে গেল। কিছু কেনাকাটা করে থলে ভর্তি সোনার মোহর নিয়ে গাঁয়ে ফিরল। গাঁয়ের প্রত্যেককে বলতে লাগল যে সে রাজধানীতে কুকুর বিক্রি করে এত সোনার মোহর লাভ করতে পেরেছে ও রাজধানীতে কুকুরের ভীষণ চাহিদা আছে।

সেই গাঁয়েরই একটা গরিব লোকের মনে আশা জাগল কিছু সোনার মোহর রোজগারের। সাত পাঁচ ভেবে সে ঐ ধনী লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবু, কুকুরের ব্যাপারে যা শুনেছি তা কি সত্য ?"

"হ্যাঁরে! বিশ্বাস হল না ? রাজা মাত্যাস অন্ধ খোঁড়া কুকুর খুঁজছেন। কথাটা জানার সঙ্গে সঙ্গে হাতে যা ছিল খরচ করে কুকুর জোগাড় করে সোজা রাজার কাছে বিক্রি করে এলাম। ভাল দাম পেয়েছি। তুমি গরিব, তোমার উপকার হবে।" ধনী লোকটা বলল।

গরিব ধনীর কথায় বিশ্বাস করল। তার মনেও ধন রোজগারের প্রবল ইচ্ছা জাগল।

হাঙ্গেরীর লোককথা

কিন্তু তার নিজের কাণা কড়িরও মুরোদ ছিল না। এমন কোন জিনিসও নেই যা বিক্রি করে কিছু টাকা পাবে। আছে এক হাড্ডিসার গরু। শেষ পর্যন্ত সে সেই রোগা গরুটাকেই বিক্রি করে যা পেল তাই দিয়ে গোটা কয়েক কুকুর কিনে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাজধানীর দিকে চলল।

গরিব লোকটা রাজপ্রাসাদে গেল বটে কিন্তু ভিতরে যেতে পারল না। পাহারা-দারের কাছ থেকে বাধা পেল। তখন গরিব লোকটা বুঝতে পারল যে ধনী লোকটা তার সঙ্গে মারাত্মক রসিকতা করেছে। তাকে ঠকিয়েছে। বেচারা নিরুপায় হয়ে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগল।

উপর থেকে রাজা এসব ব্যাপার লক্ষ্য করছিলেন। তিনি একটা লোককে কুকুর নিয়ে রাজদরবারে আসতে দেখে কৌতুক বোধ করলেন। রাজা ঐ লোকটাকে ধরে আনতে লোক পাঠালেন। গরিব লোকটা রাজার কাছে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বলল।

গরিব লোকটার উপর রাজার একটু দয়া হল। রাজা জানালেন যে তিনি কুকুর কিনে থাকেন তা সত্য। রাজা গরিব লোকটার কাছ থেকে কুকুর নিয়ে একশো সোনার মোহর দিয়ে জেনে নিলেন ধনী লোকটার নাম ঠিকানা। গরিব লোকটার তো আনন্দের সীমা নেই, সবাইকে জানাল এবং সোনার মোহরও দেখাল।
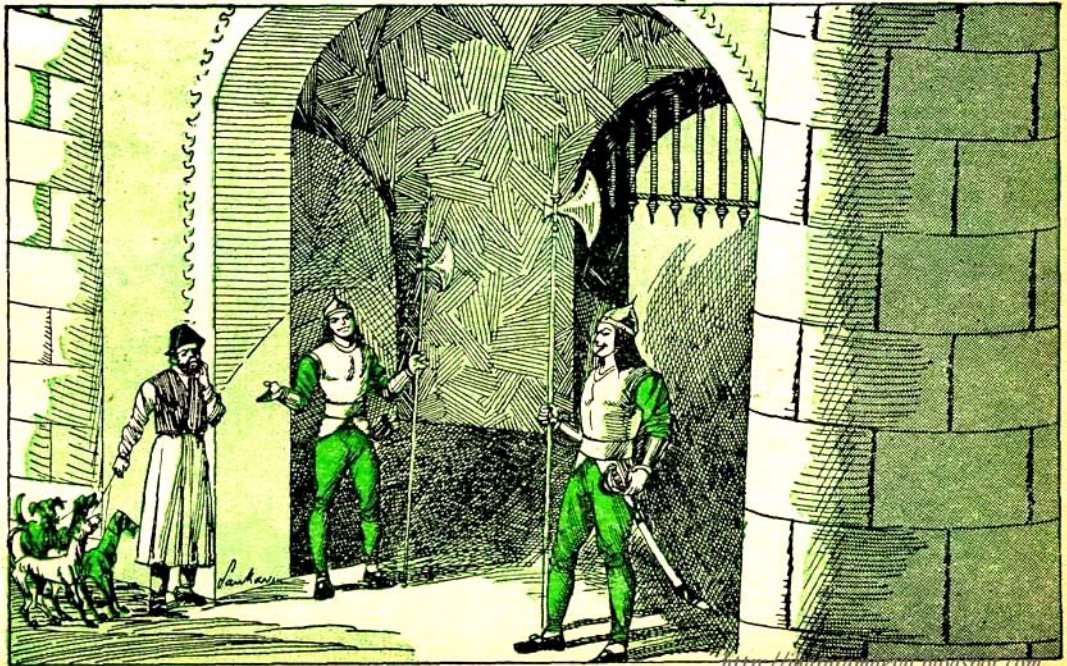
ধনী লোকটা ভাবল কোথায় ভেবে ছিলাম আমার কথায় বিশ্বাস করে যারা কুকুর নিয়ে যাবে তারা ঠকবে। আর একি হল! উল্টে সত্যি সত্যি সোনার মুদ্রা নিয়ে এল! ঠাট্টা করে যা প্রচার করলাম তা সত্যি হল!

এবারে ধনীর মনেও কুকুর বিক্রি করে টাকা পয়সা রোজগারের ভীষণ ইচ্ছে জাগল। সে নিজের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দিল। ঐ অর্থ দিয়ে হাজার হাজার কুকুর কিনল। তারপর সমস্ত কুকুর নিয়ে একবার রাজধানীতে হাজির হল। পাহারাদার তাকে এবং তার কুকুরদের রাজপ্রাসাদের ভিতরে যেতে দিল না। ধনী লোকটা রেগে গিয়ে ধমক দিল। কিন্তু পাহারাদারও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সেও পাল্টা ধমক দিয়ে ধনী লোকটাকে ভাগিয়ে দিতে লাগল। কুকুরগুলোও ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

রাজা এই হৈ চৈ উপর থেকে শুনে পাহারাদারকে আদেশ দিলেন ঐ ধনী লোকটাকে কুকুর সহ ভিতরে আনতে।

ধনী লোকটা রাজাকে জানাল যে সে তাঁর কাছে কুকুর বিক্রি করতে এসেছে। ধনীর নাম শুনেই রাজা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝলেন। রাজা ভাবলেন যে এই লোকটাই তো গরিবের সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। রাজা ধনীকে বলল, “আমি একবারই কুকুর কিনে থাকি। এখন আর কুকুরের দরকার নেই। তুমি এত দেরি করে এলে! আগে এলে তোমার কাছ থেকেই কিনতাম।

ধনী লোকটা যে ভাবে কুকুরদের নিয়ে নিজের গ্রাম থেকে শহরে গিয়েছিল ঠিক তেমনি তাদের নিয়ে গ্রামে ফিরল। ধনী লোকটার সম্পত্তির আর কিছুই রইল না। এই ঘটনার পর গ্রামের লোকগুলো ধনীর কুকুর বিক্রি করতে যাওয়ার ব্যাপারটাকে রসিয়ে রসিয়ে গল্প করত।

কবির সম্মান

দেবগিরিতে বিখ্যাত এক কবি ছিলেন। প্রত্যেক বছর তিনি স্ত্রীকে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াতেন। যেখানে যেতেন সেখানকার রাজার প্রশংসা করে কবিতা রচনা করতেন। রাজা তাঁকে সম্মানিত করতেন। কবি পেতেন বহু উপহার ও অর্থ। সে সব নিয়ে কবি ফিরে আসতেন দেবগিরিতে।

একবার ঐ কবি অমরাবতীতে পৌঁছালেন। স্বামী-স্ত্রী সেখানকার যা কিছু ছিল সব দেখলেন। সেখানে লোকের মুখে কবি শুনলেন যে সেখানকার রাজা প্রজাদের সুখে রেখেছেন। ঐ রাজা পণ্ডিত বা কবিদের খুব পছন্দ করেন। স্ত্রীকে ধর্মশালায় রেখে কবি গেলেন রাজার কাছে। রাজদরবারে গিয়ে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে রাজাকে শোনালেন।

কবির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "অমরাবতীতে থাকবেন?"

"আজ্ঞে না মহারাজ। আমি তীর্থ করার উদ্দেশ্যে দেশে দেশে ঘুরি। স্থায়ী বাসস্থান দেবগিরি। অন্য কোথায়ও আমি থাকব না।" কবি জবাব দিল।

কবির কথা শুনে রাজা কেমন যেন নিরাশ হলেন। রাজা চাইতেন না যে তার দেশের পয়সা অন্য কোন দেশে যাক। তিনি চাইতেন তাঁর দেশের সমৃদ্ধি। রাজার ইচ্ছা করছিল না কবিকে কোন পুরস্কার দিতে।

অমন সুন্দর কবিতা যখন তাকে নিয়ে লিখেছেন তখন কিছু না দিয়েই বা পারা যায় কি করে। আহারের পর রাজার কাছ থেকে সুন্দর বস্ত্রও পেলেন কিন্তু তার মন উঠল না। তবু প্রসন্নতার অভিনয় করে গেলেন।

অনিমা দেবী

"আপনি রাজার কাছে গিয়ে ছিলেন ? রাজার নামে প্রশংসা করে কবিতা লিখে-ছেন ? রাজা আপনাকে কোন পুরস্কার দেন নি ?" কবির স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

"ও বেচারার কাছে কী বা আছে দেবার ?" কবি বললেন।

"রাজার কাছে কি ধন সম্পত্তি নেই ?" স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"আমারই ভুল হয়েছে। যে বিদ্বান নয় তাঁকে আমি পণ্ডিত বলে কবিতা রচনা করেছি। তাঁকে আমি রসিক সম্রাট আখ্যা দিয়েছি আমার কবিতায়। যে বিড়াল দেখলে ভয় পায় তাঁকে আমি বীরপুরুষ হিসেবে চিত্রিত করেছি। এত ভাল কথা শুনেও রাজা কিছুই দেননি শুধু খাইয়ে একটা বস্ত্র দান করে বিদেয় দিলেন।" কবি বললেন।

"ঐ খাবারটাও তো জনতার সম্পত্তি।" স্ত্রী বললেন।

ঐ ধর্মশালায় প্রায় প্রত্যেকে রাজার গুপ্তচর ছিল। তাই কবি ও তাঁর স্ত্রীর মধ্যে যে কথাগুলো হল তার প্রত্যেকটি রাজার কানে সেই রাতেই পৌঁছে গেল।

পরের দিন কবি স্ত্রীকে নিয়ে দেবগিরির দিকে রওনা দিলেন। কিছুক্ষণ পর ওঁরা একটা গরুর গাড়ি পথে দেখতে পেলেন। গরুর গাড়ির লোকটা দেবগিরি যাচ্ছে বলে কবি ও তার স্ত্রীকে গাড়িতে বসাল।

কবির বাড়ি পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যে অমরাবতী থেকে দূত এল। কবির সামনে একটা পোঁটলা রেখে বলল, "মহারাজ আপ-নাকে পঞ্চাশ হাজার মুদ্রার পুরস্কার পাঠিয়ে-ছেন। সেখানে দিলে আপনি তুলতে পারবেন না বলে এখানে পাঠিয়েছেন।" একথা বলে পোঁটলা রেখে দূত চলে গেল।

সেই বছরই কবি দেবগিরি থেকে অমরাবতী চলে গেলেন। অমরাবতীতেই স্থায়ী বাসস্থান করে নিলেন।
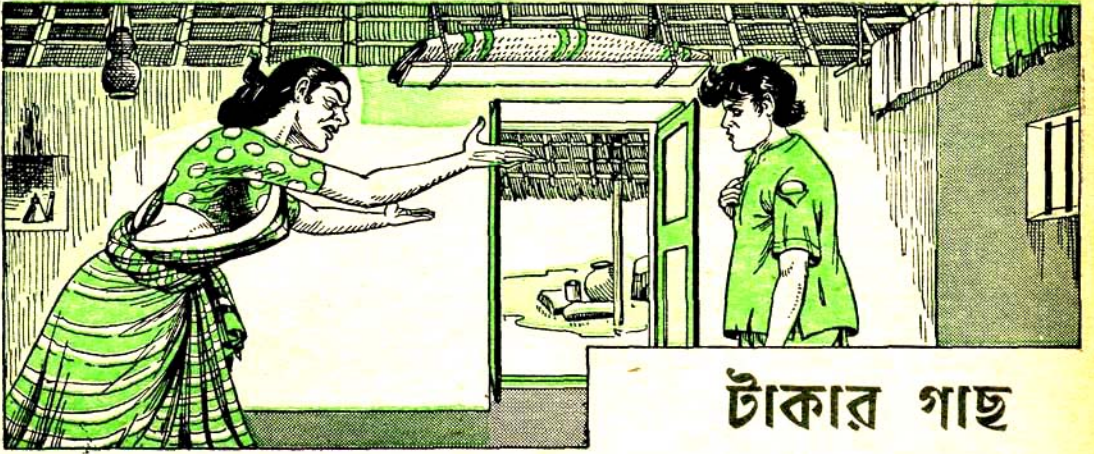
টাকার গাছ

রামকানাইয়ের বয়স যখন দশ বছর তখন তার বাবা মারা গেল। পরিবারে নেমে এল বিষাদের ছায়া। রামকানাইয়ের মা রাত দিন কাজ করে খাওয়া পরার ব্যবস্থা করল।

রামকানাই বড় হল। কিন্তু ছেলের মন কাজকর্মের দিকে বসছিল না। ছেলে কাজ করে না, সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। শুধু তাই নয় বুদ্ধি শুদ্ধি বলতে রামকানাইয়ের কিছু ছিল না। যখন তখন মার কাছে পয়সা চাইত। মাকে জ্বালাত।

একদিন তার মা ভীষণ রেগে গিয়ে বলল, "বাবা, তুই যে সব সময় পয়সা চাস। তুই ভেবেছিসটা কি? অ্যাঁ? বলি আমাদের কি টাকার গাছ আছে যে নাড়া দিলেই পড়বে?"

"ঠিক আছে তোমাকে দিতে হবে না। এবার থেকে আমিই রোজগার করব। টাকা মাটিতে পুঁতে দেব। তারপর গাছ হবে। যত পয়সা চাই পাব।" রামকানাই বলল।

"ওরে পাগলা টাকা পুঁতলে গাছ হয় না! বিশ্বাস না হয় খুঁজে খুঁজে দেখ কোথাও টাকার বীজ পাস কিনা।" রামকানাইয়ের মা বলল।

বোকা ছেলে মার কথা মত বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে। খোঁজ করল টাকার বীজের। রামকানাই চেনাজানা ধনীদের জিজ্ঞেস করল টাকার বীজ কোথায় পাওয়া যায়। ধনীরা রামকানাইয়ের বোকামী দেখে বলল, "টাকার বীজ তো পাওয়া যায়। এখানে পাওয়া যায় না, বনে যাও পাবে।"

রামকানাই তাদের কথা বিশ্বাস করে বনে গেল। বনে একটা বুড়িকে কাঠখুড়ো কুড়োতে দেখল।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

"দিদিমা, টাকার বীজ কোথায় পাওয়া যায় বলত ?" রামকানাই জিজ্ঞেস করল। বুড়ি তার দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদুভাই, সন্ধ্যে হয়ে এল। এখন গোটা কয়েক কাঠ কুড়োও দিকি, তারপরে বলছি।"

রামকানাই মহাখুশী। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে অনেক কাঠ জমা করল। অন্ধকার হয়ে এল। বুড়ি বলল, "দাদুভাই, আমি বুড়ো হয়েছি। এত বোঝা আমি একা বইতে পারব না। তুমি যদি আমার বাড়িতে বোঝাটা দিয়ে আসতে, বড় উপকার হত ভাই!"

রামকানাই কাঠের বোঝা মাথায় করে বুড়ির পিছনে পিছনে গেল তার বাড়ি।

তারপর বুড়ি বলল, "দাদুভাই, এই কাঠগুলো বিক্রি করে এসো না ভাই।"

রামকানাই কাঠের বোঝা মাথায় করে গাঁয়ের লোকের দরজায় ফিরি করল। কাঠ বিক্রি করে টাকা এনে বুড়ির হাতে দিল। বুড়ি খুব খুশী হল।

"দিদিমা, বল না টাকার গাছের বীজ কোথায় পাব।" রামকানাই জিজ্ঞেস করল।

"সময় হলে আমি নিজেই বলব। ততদিন তুমি অপেক্ষা কর।" বুড়ি বুঝিয়ে বলল।

সেদিন থেকে রামকানাই বুড়ির কাছেই থাকতে লাগল। বুড়ির কথামত সে প্রত্যেক দিন বনে যেত, কাঠ কাটত, ঐ কাঠ বিক্রি করে যা পেত তা বুড়ির হাতে দিত।"

এইভাবে রামকানাইয়ের দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। একদিন বুড়ি টাকা পয়সার একটা পোঁটলা এনে তার হাতে দিল। পোঁটলা হাতে নিয়ে সে তো অবাক।

তা দেখে বুড়ি বলল, "এসব তোমারই খাটুনির দাদুভাই। পরিশ্রমই হচ্ছে টাকার গাছের বীজ। এই পোঁটলা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। পরিশ্রম করে মাকে খুশী কর।"

সেদিম রামকামাই বুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। ছেলে রোজগার করে টাকা এনেছে দেখে মার খুব আনন্দ হল।

মহাভারত

দিব্যদৃষ্টি পেয়ে ধৃতরাষ্ট্রও কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখলেন। দেবতা গন্ধর্ব ঋষি প্রভৃতি প্রণাম করলেন, এবং হাত জোড় করে বললেন, "প্রভু সংযত কর তোমার এ রূপ, না হলে জগৎ ধ্বংস হবে।" কৃষ্ণ তখন পূর্বের রূপ ধারণ করে ঋষিদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে সাত্যকি আর বিদুরের হাত ধরে সভা থেকে বিদায় নিলেন।

দারুক যে রথ এনেছিল, সেই রথে উঠে যাবার উদ্যোগ করতেই ধৃতরাষ্ট্র কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, "জনার্দন, ছেলেদের উপর আমার ক্ষমতা কতটুকু তা তুমি সচক্ষে দেখলে। কোন খারাপ মতলব নেই। দুর্যোধনকে যা বলেছি তা তুমি শুনেছ। সর্বপ্রকারে আমি শান্তির চেষ্টা করেছি, এটা সকলেই জানে।"

তখন কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম ও দ্রোণ সকলকে বললেন, "কৌরবসভায় যা হল তা আপনারা সকলেই জানেন। দুর্যোধন আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করছে তাও আপনাদের অজানা নয়। ধৃতরাষ্ট্রও বলছেন তাঁর কোন ক্ষমতা নেই। এখন আমায় বিদায় দিন আমি যুধিষ্ঠিরের কাছে ফিরে যাই।" একথা বলে কৃষ্ণ গেলেন কুন্তীর সাথে দেখা করতে।

কুন্তীকে প্রণাম করে কৃষ্ণ তাঁকে কৌরবসভায় যা হয়েছিল সমস্ত জানালেন।

কুন্তী বললেন, "কেশব, আমার এই কথাগুলো বলো। পুত্র, তুমি মন্দমতি

শোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত শুধু শাস্ত্র কথা মনে করে মতিভ্রম হচ্ছে। শুধু তুমি একা ধর্ম চিন্তাই করছ। বাহু বলই একমাত্র ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। সব সময় নিষ্ঠুর কাজে থেকে তাঁদের প্রজা পালন করতে হয়। রাজা যদি উপযুক্ত ভাবে শাসন করেন এবং প্রজাদের সুখ সুবিধে দেখেন তবেই তাঁর সত্যিকার ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করা হয়। যুগের প্রভাবেই রাজা ন্যায় অন্যায় করে না। রাজার সৎ কাজের ফলেই সত্য ত্রেতা দ্বাপর বা কলি যুগ উৎপন্ন হয়। তুমি পিতৃপিতামহের আচরিত রাজার ধর্ম পালন কর। তুমি যে ধর্ম বেছে নিতে চাও তা রাজর্ষিদের ধর্ম নয়। অহিংসা ও দুর্বল মন নিয়ে কোন রাজা প্রজা পালন করতে পারেন না। আমি প্রতি মুহূর্তে এই আশীর্বাদই করছি তোমায়। তুমি দান, যজ্ঞ ও তপস্যা করে প্রজা, বংশ বল ও ক্ষমতা লাভ কর। তোমার বাহুবলে আর দণ্ডনীতির দ্বারা পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার কর। তোমার মা হয়ে আজ আমাকে পরের দেওয়া অন্নের আশায় থাকতে হয়। এর চেয়ে কি আর দুঃখ আছে।”

এরপর কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন। আর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সকলের কাছে বিদায় নিলেন। তারপর কর্ণকে নিজের রথে তুলে নিয়ে সাত্যকির সাথে যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, “রাধেয়, তুমি বেদ বিশারদ ব্রাহ্মণদের সেবা করেছ। তাঁদের কাছে তুমি ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্ব শিখেছ। কর্ণ, তুমি ধর্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র। কাজেই তুমি রাজা হও। তোমার পিতৃকুল এবং মাতৃকুল উভয় পক্ষই তোমার সহায় থাকবে। আজ তুমি আমার সাথে চল। পাণ্ডবরা জানতে পারবে তুমিই তাঁদের বড় ভাই। তোমার পাঁচ ভাই, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং অভিমন্যু তোমার পদসেবা করবেন। যে রাজারা এসেছেন এবং অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় সকলেই তোমার পদানত হবেন। রাজা ও রাজকন্যারা তোমার

অভিষেকের আয়োজন করবেন। অভিষেকের জন্য হিরণ্ময়, রজতময় ও মৃণ্ময় কুম্ভু এবং ওষধি বীজ রত্ন প্রভৃতি নানা প্রকার বহু-মূল্য উপকরণ নিয়ে তাঁরা আসবেন। দ্রৌপদীও তোমার সঙ্গে মিলিত হবেন। আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজার পদে বসাব। যুধিষ্ঠির যুবরাজ হবেন এবং চামর হস্তে তোমার পেছনে থাকবেন। কুন্তী-নন্দন, তুমি পাঁচ ভাইয়ের সাথে একত্র হয়ে রাজ্য শাসন কর। মাতা কুন্তী ও হিতা-কাঙ্খীরা আনন্দিত হবেন। পাণ্ডবদের সাথে তোমার অন্তরের মিলন হবে।"
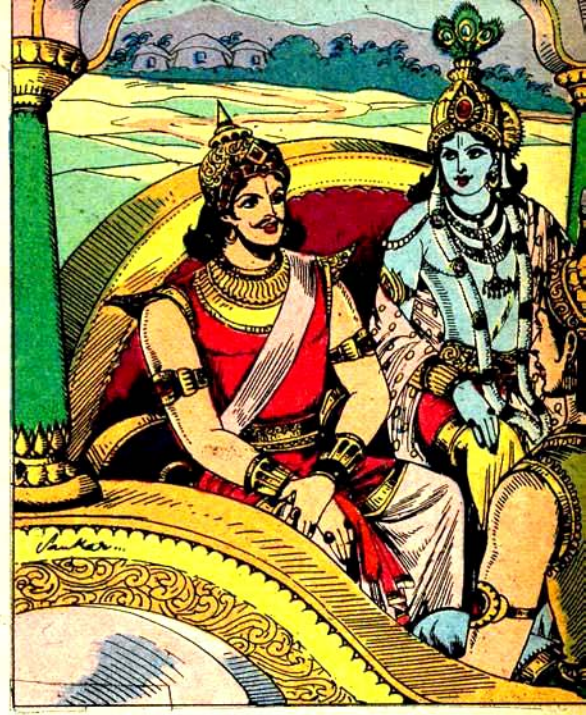
কর্ণ বললেন, "হে কেশব, তুমি যা বললে তা আমি সবই জানি। ধর্মশাস্ত্র মতে আমি কুন্তীরই ছেলে। মাতা কুন্তীর কুমারী অবস্থায় সূর্যের ঔরসে তাঁর গর্ভে আমার জন্ম। তিনি তখন ভাল মন্দ বিচার না করেই আমাকে ত্যাগ করেন। কিন্তু অধিরথ আমাকে তাঁর ছেলে বলেই মনে করেন। আর আমিও তাঁকে পিতা বলে জানি। জাতের কাজ কর্ম সবই তিনি আমাকে করিয়েছেন। তাঁর আনীত ব্রাহ্মণরা আমায় বসুষেণ নাম দিয়েছেন। তাঁর আশ্রয়েই যৌবন লাভ করে বিবাহ করেছি। পত্নীদের সাথে আমার প্রেমের সম্পর্ক আছে। তাঁদের গর্ভে আমার ছেলে মেয়ে হয়েছে। সুখের লোভে সমস্ত পৃথিবীই বলো আর রাশি রাশি স্বর্ণ ই বলো তাতে আমি আমার সত্যকে ভুলে যেতে পারি না। একটি মুহূর্তের জন্যও সে সব মিথ্যে কাজ করতে পারি না। হে কৃষ্ণ, তের বছর আমি দুর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে নির্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করেছি। বিবাহ ও যজ্ঞ অনুষ্ঠান সবই আমি সূতগণের সাথে করেছি। আমার ওপর নির্ভর করেই দুর্যোধন যুদ্ধের আয়োজন করেছেন। অর্জুনের বিপক্ষে যোদ্ধারূপে আমাকেই স্থির করেছেন। মৃত্যু বা বন্ধন অথবা লোভ আর খ্যাতির বশে তাঁর সাথে-আমি বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারি না। তবে তুমি যা বলছ তা অবশ্যই মঙ্গলের জন্য।

জনার্দন, তোমার আমার এই কথাবার্তা গোপন রেখো। ধার্মিক যুধিষ্ঠির যদি জানতে পারেন আমি কুন্তীরই ছেলে, তবে তিনি আর রাজ্য নেবেন না। আর আমি যদি রাজ্য পাই তাহলে সে রাজ্য আমি দুর্যোধনকেই দান করব।”
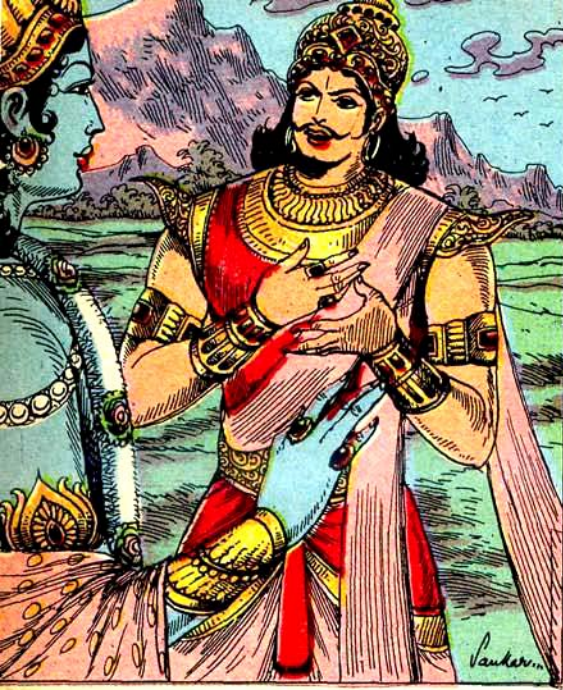
কৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন, “কর্ণ, তোমাকে আমি পৃথিবীর রাজ্য দিতে চাইছি অথচ তা তুমি কিছুতেই গ্রহণ করবে না। পাণ্ডবেরা যুদ্ধে জয়লাভ করবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি তাঁদেরকে তুমি গিয়ে বলবে, এই মাস অতি শুভ। আর সাত দিন পরে অমাবস্যার দিনই যুদ্ধ আরম্ভ হবে। যে রাজারা যুদ্ধের জন্য একত্র হয়েছেন, তাঁদের বলো যে তাঁদের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। দুর্যোধনের পক্ষের রাজা ও রাজপুত্রগণ অস্ত্রের আঘাতে নিহত হয়ে স্বর্গলাভ করবেন।”

এর পর কর্ণ কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরলেন এবং রথ থেকে নেবে বিদায় নিয়ে নিজের রথে উঠে প্রস্থান করলেন।

কৃষ্ণ চলে যাওয়ার পর বিদুর কুন্তীকে বললেন, “আপনি তো জানেন যে যুদ্ধ যাতে না হয়, এজন্য আমি সব সময় আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুর্যোধন শোনবার পাত্র নয়। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রও পুত্র স্নেহে অন্ধ হয়ে অধর্মের পথে যাচ্ছেন। কৃষ্ণ বিফল হয়ে যখন ফিরে গেলেন, এবার পাণ্ডবরা যুদ্ধের আয়োজন করবেন।”

কুন্তী দুঃখিত হলেন, ভাবলেন যুদ্ধ হলে দোষ না হলেও দোষ। দুর্যোধনের দলে ভীষ্ম, দ্রোণ আর কর্ণ থাকবেন। তাই আমার আশঙ্কা। দ্রোণ হয়তো তাঁর শিষ্যের সাথে যুদ্ধ করতে চাইবেন না। পিতামহ ভীষ্মও হয়তো পাণ্ডবদের উপর স্নেহশীল থাকবেন। কিন্তু দুর্মতি কর্ণই দুর্যোধনের কথায় ভুলে পাণ্ডবদের হিংসা করেন। আর এর জন্যই আমার এত ভয়। কুমারী অবস্থায় যাকে আমি গর্ভে ধারণ করেছি, সেই কর্ণ কি আমার অনুরোধ রাখবে না? এই সব নানা কথা ভেবে

কুন্তী গেলেন গঙ্গার তীরে। পূব মুখে ও ঊর্দ্ধবাহু হয়ে কর্ণ সেখানে জপ করছিলেন। জপ শেষে পেছনে কুন্তীকে দেখে অবাক হয়ে প্রণাম করলেন। তারপর করযোড়ে বললেন, "আমি অধিরথ-রাধার পুত্র কর্ণ। আপনাকে অভিবাদন করছি। আদেশ করুন কি করব আমি।"

কুন্তী বললেন, "কর্ণ, তুমি কৌন্তেয়, রাধার গর্ভে তোমার জন্ম হয়নি। অধিরথও তোমার পিতা নন। সূতকুলেও তোমার জন্ম নয়। বাছা, কুন্তীভোজের গৃহে, আমার কুমারী অবস্থায় তুমিই আমার প্রথম সন্তান হয়ে জন্ম নিয়েছিলে। বৎস, তুমি তোমার ভাইদের চেননা জাননা তাই দুর্যোধনের সেবা করছ। এ তোমার উচিত হচ্ছে না। অর্জুন যে রাজলক্ষ্মী পূর্বে অর্জন করে-ছিলেন, ধৃতরাষ্ট্রগণ লোভের বশে যা হরণ করেছে, তা তুমি নিজ বাহুবলে লাভ করে যুধিষ্ঠিরের সাথে সুখে ভোগ কর। কৌরবরা দেখুক যে কর্ণার্জুন ভ্রাতৃবন্ধনে মিলিত হয়েছেন। কৃষ্ণ-বলরামের মত মিলিত হলে তোমাদের অসাধ্য আর কি থাকতে পারে?"

কর্ণ বললেন, "ক্ষত্রিয় মাতা, আপনার কথায় আমার ভক্তি জাগেনি। আপনার অনুরোধ ন্যায় সঙ্গত বলে মনে করি না। আমাকে ত্যাগ করে যে অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ খ্যাতি সবই নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম হলেও আপনার জন্যই ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কোন শত্রুও এর চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে না। সময় কালে আপনি আমাকে দয়া করেন নি। এখন আপনার স্বার্থেই আমাকে উপদেশ দিতে এসেছেন। কৃষ্ণ-অর্জুনের মিলিত অবস্থায় কে না ভয় করে? এখন আমি পাণ্ডব দলে যোগ দিলে সবাই ভাববে ভয়ে তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছি। আমি যে পাণ্ডবদের ভাই তাতো কেউ জানে না। এ যুদ্ধের সময়ে যদি পাণ্ডব পক্ষে যাই তবে ক্ষত্রিয়রা আমাকে কি ভাববে? ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ আমার
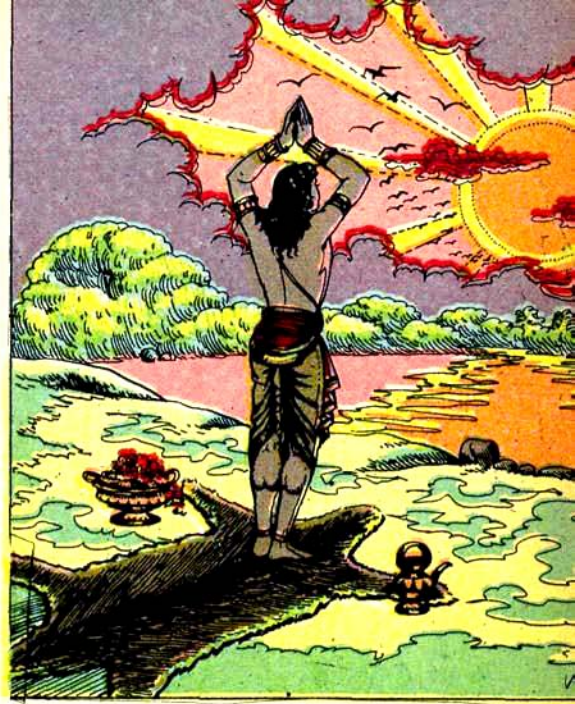
সমস্ত আশা আকাঙ্খা পূর্ণ করেছেন। আমাকে সম্মানিতও করেছেন। এখন কি করে আমি তাঁদের ছেড়ে যাব ? কি করে তাঁদের হতাশ করব ? কিন্তু আপনার এ আসা ব্যর্থ হবে না। সক্ষম হলেও আমি আপনার সব ছেলেকে বধ করব না। শুধু মাত্র অর্জুনকে বধ করেই আমার ইচ্ছে পূর্ণ করব। আর না হয় তাঁর হাতে নিহত হয়ে যশোলাভ করব। হে ক্ষত্রিয় মাতা, যেই মরুক অর্জুন অথবা আমাকে নিয়ে আপনার পাঁচ পুত্রই থাকবে।"

শোকে দুঃখে ভারাক্রান্ত কুন্তী কম্পিত দেহে পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "কর্ণ, তুমি যা বললে তাই হবে। কুরু-কুলেরই ক্ষতি হবে। এ দৈব সত্য। তবে অর্জুন ভিন্ন অন্য চার ভাইকে তুমি অভয় দান করেছ মনে রেখো। এই বলে কুন্তী আশীর্বাদ করলে কর্ণও তাঁকে প্রণাম করলেন।

উপপ্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ তাঁর দৌত্যের বিবরণ সবিস্তারে যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে দিলেন, "আমি মিষ্টি কথায় দুর্যোধনকে অনেক অনুরোধ করেছি। সভায় উপস্থিত রাজাদের তিরস্কার করেছি। দুর্যোধনকে তৃণের মত অবহেলা করে কর্ণ আর শকুনিকে ভয় দেখিয়েছি। ধৃতরাষ্ট্র-গণের ব্যবহারের প্রচুর নিন্দা করেছি।"

যুধিষ্ঠির তাঁর ভাইদের বললেন, "তোমরা কেশবের কথা শুনলে তো ? এখন সৈন্য ভাগ কর। সাত অক্ষৌহিণী এখানে একত্র হয়েছে। তাদের নায়ক বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকী, চেকিতান ও ভীমসেন। সহদেব, তোমার মতে এই সাত জনের মধ্যে যিনি নেতা হবার উপযুক্ত, তাঁর নাম বল।"

সহদেব বললেন, "মৎস্যরাজ বিরাটই এই কাজের যোগ্য।"

নকুল বললেন, "আমাদের শ্বশুর দ্রুপদই সেনানায়ক হবার যোগ্য।"

অর্জুন বললেন, "যে দিব্য পুরুষ তপস্যার প্রভাবে এবং ঋষিগণের অনুগ্রহে উৎপন্ন হয়েছিলেন, যিনি খড়্গ ও কবচ

ধারণ করে রথে আরোহন করে অগ্নিকুণ্ড থেকে উঠেছিলেন, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নই সেনাপতিত্বের যোগ্য।"

ভীম বললেন, "সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ বলেন যে দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীই ভীষ্মবধের জন্য জন্মেছেন। ইনি রামের মত রূপবান, এমন কেউ নেই যে এঁকে অস্ত্রাঘাত করতে পারে। এঁকেই সেনাপতি করুন।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণই আমাদের জয় পরাজয়ের মূল। সুখে দুঃখে সর্বদাই রয়েছেন আমাদের সাথে। ইনিই বলুন কে আমাদের সেনাপতি হবেন।"

কৃষ্ণ অর্জুনের দিকে একবার তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, "মহারাজ, যাঁদের নাম করা হল তাঁরা সকলেই সেনাপতি হবার যোগ্য। তবু আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপতি মনোনীত করছি।" কৃষ্ণের কথায় পাণ্ডবগণ এবং অন্যান্য সকলেই খুশী হলেন।

যুদ্ধের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। সৈন্যগণ চঞ্চল হয়ে উঠল। হস্তী ও অশ্বের চিৎকার, রথের চাকার ঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খ-দুন্দুভির নিনাদে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল। সেই বিশাল সৈন্যবাহিনী সমুদ্রের তরঙ্গের মত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বর্মে ও অস্ত্রের সাজে যোদ্ধারা আনন্দিত হয়ে চলতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির রইলেন তাঁদের মাঝখানে। দুর্বল সৈন্য ও পরিচারকগণও তাঁর সাথে চলল। শকট, বিপণি, বেশ্যাদের বস্ত্রগৃহ, কোষ, যন্ত্রায়ুধ ও চিকিৎসকগণও তাঁর সাথে চলতে লাগল। দ্রৌপদী তাঁর দাসদাসী ও অন্যান্য স্ত্রীদের নিয়ে উপপ্লব্য নগরেই থাকলেন।

পাণ্ডব বাহিনী কুরুক্ষেত্রে হাজির হল। যুধিষ্ঠির শ্মশান, দেবালয়, মহর্ষিদের আশ্রম ও তীর্থস্থান ত্যাগ করলেন। যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ পাওয়া যায় এমন এক সমতল স্নিগ্ধ স্থানে সৈন্য সমবেত করে সাজালেন।

শিবলীলা

[পাঁচ]
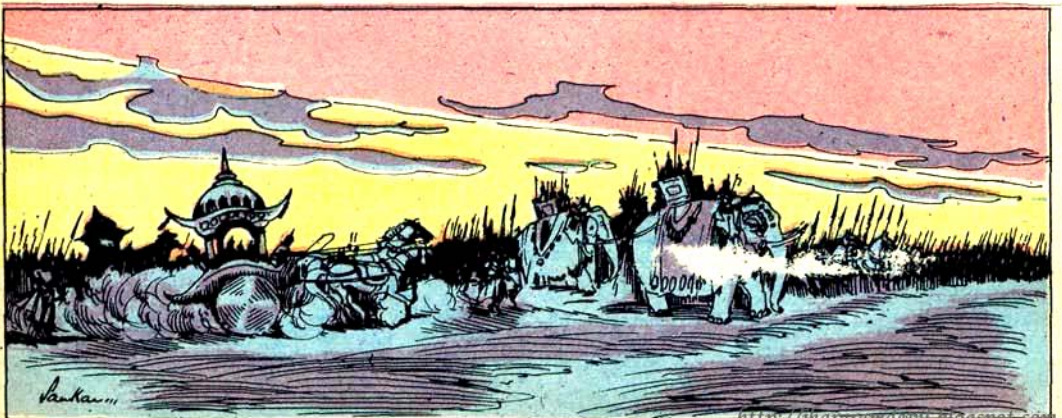
ভারতের দক্ষিণে পোত্তপিনাড়ু নামক বন ছিল। সেখানে ছিল শবরদের বাস। উড়ুমুরু ছিল রাজধানী। বনে শবররা চাষ আবাদ ও শিকার করে পেট চালাত।

শবর জাতের রাজা ছিল নাথনাথ। তার স্ত্রীর নাম ছিল তাণ্ডে। আর ছেলের নাম ছিল তিন্নাড়ু। বড় হয়ে তিন্নাড়ু অস্ত্রবিদ্যা শিখতে লাগল। তিন্নাড়ু এমন শিকারী হয়ে উঠল যে বনের ছুটন্ত হরিণ অথবা আকাশে উড়ন্ত যে কোন পাখিকে সে তীর বিদ্ধ করতে পারত।

শবর জাতের লোকেরা রাজাকে বলল যে তিন্নাড়ুকে শিকার করা শেখাতে হবে। তার জন্য শবররা প্রথমে শিবের পূজা করল, জন্তু জানোয়ার বলি দিল, মহুয়ার মদ খেয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে মিছিল বের করে আনন্দ করতে লাগল। পরের দিন শিকারের জন্য প্রয়োজনীয় জাল, ফাঁদ, কুকুর প্রভৃতি তৈরি করল। তারপর সেজেগুজে তিন্নাড়ু জাত ভাইদের সঙ্গে তিরুপতির পাহাড়ের দিকে গেল।

শবররা নানা ধরণের বুনো জানোয়ার ও পাখি মারল। মাংসের টুকরো লোহার শলাকায় ঢুকিয়ে পোড়াল আর খেল। এই ভাবে শিকার করে বেশ কয়েকদিন কাটাল।

একদিন শিকার করতে করতে তিন্নাড়ু ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আর থাকতে না পেরে একটা গাছের নিচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখল এক মহাপুরুষের। তার গায়ে মাখা ছিল বিভূতি। গায়ে জড়ানো ছিল

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

বাঘের চামড়া। মাথায় ছিল জটা। কাঁধে ঝুলছে মুণ্ডমালা। কণ্ঠে লিঙ্গ। সেই মহাপুরুষ তিন্নাড়ুকে বললেন, "বৎস, এখানকার পাহাড়ের কোলে সুবর্ণমুখীর তটে বটগাছের নিচে শিব আছেন। তুমি তাঁর পূজা কর।

তিন্নাড়ু চমকে উঠল। চোখ কচলে অবাক হয়ে চারদিক তাকাল। তার সঙ্গী সাথীরা শিকার করতে ব্যস্ত। ইতিমধ্যে এক বুনো শুয়োর আর্তনাদ করতে করতে সেদিকে ছুটে এল। তিন্নাড়ু শুয়োরের পিছনে ধাওয়া করল। পরক্ষণে ঐ শুয়োর অদৃশ্য হয়ে গেল। আর যেখানে অদৃশ্য হল ঐ শুয়োর সেই খানেই একটা শিব মন্দির দেখা দিল। স্বপ্নে মহাপুরুষ যে মন্দিরের কথা বলে ছিলেন এটাই যেন সেটা। তখন তিন্নাড়ু স্বপ্ন থেকে মন্দির পর্যন্ত যা কিছু ঘটল সবটাকেই শিবের লীলা হিসেবে ধরে নিল। তারপর তিন্নাড়ু মন্দিরে ঢুকে সেখানকার লিঙ্গকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলল, "তুমি এখানে একা পড়ে আছ কেন প্রভু? এখানে কত বাঘ। এই নদীর ধারে একা থাক। তোমাকে খেতে দেয় কে? কি করে বাঁচ? তুমি এখানে না থেকে চলে এসো না আমাদের বাড়িতে! আমাদের বাড়ি উড়ুমুরুতে। আমার দিদি আর বোনেরা তোমাকে শুয়োর, হরিণ আর পাখির মাংস রান্না করে খাওয়াবে। ভাল ভাল চালের ভাত খাওয়াবে। পায়েস খাওয়াবে। এর পরেও যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাও তাহলে আমিও এখান থেকে নড়বো না।"

ইতিমধ্যে অন্য শবররা তিন্নাড়ুর খোঁজ করতে করতে সেখানে এসে বলল, "কি হল তুমি যে শুয়োরের পিছনে ধাওয়া করে ছিলে, সেটা কোথায়?" কিন্তু ঐ কথা-গুলো যেন তিন্নাড়ুর কানে গেল না। সে কোন জবাব দিল না। শবরেরা তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করল।

শিব আমার সঙ্গে গেলে তবেই আমি বাড়ি ফিরব, না গেলে আমিও যাব না।" তিন্নাড়ু

জবাবে বলল। সে আবার শিবের ধ্যানে মগ্ন হল। অগত্যা অন্য শবররা ফিরে গেল।

তিন্নাড়ু ভাবল, শিব কতদিন থেকে ক্ষুধার্ত কে জানে। একথা ভেবে সে তীর ধনুক নিয়ে শিকার করতে বেরুল। এক বুনো শুয়োর মেরে টুকরো টুকরো করে কেটে পুড়িয়ে সুবর্ণমুখী থেকে জল এনে শিবের সামনে রেখে বলল, "প্রভু, খেয়ে নাও।"

কিন্তু শিবের কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে তিন্নাড়ু কাঁদতে কাঁদতে বলল, প্রভু, তুমি যদি না খাও এই মাংস তাহলে আমি তোমার সামনেই মরে যাব।"

শিবঠাকুর তিন্নাড়ুর ভক্তি দেখে প্রসন্ন হয়ে বললেন, "ওঠো বাছা, আমি মাংস খাব।" বলে শিব সমস্ত মাংস খেয়ে নিলেন।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল। এক দিন শিবগোচর নামে এক শৈব ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে ঢুকে বলল, "ভগবান, এই এঁটো থালাগুলো কিসের? এত গন্ধ কিসের? তোমার এই পবিত্র মন্দির কে এতটা নোংরা করল? তুমি যদি না বল তাহলে আমি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে এখানেই প্রাণ-ত্যাগ করব।"

"হে ভক্ত, তুমি ঘাবড়ে যেয়ো না। আমার এক বনের অধিবাসী ভক্ত নিজের মত করে আমার সেবা করেছে। আমি তার পূজা গ্রহণ করেছি। তুমি যদি তার

ভক্তির পরিচয় পেতে চাও তো আমার পিছনে লুকিয়ে থাক।" শিব তাকে বললেন।

পরক্ষণেই তিন্নাডু মন্দিরে এল। লিঙ্গের সামনে থেকে এঁটো বাসনগুলো পায়ে সরিয়ে দিল। মুখের জল কুলকুচি করে লিঙ্গের মাথায় ঢালল। তারপর লিঙ্গের সামনে এক পাথর রেখে তার উপর মাংস রাখল।

শিবঠাকুর চান তিন্নাডুর ভক্তি কতখানি তা ভাল করে যাচাই করে দেখতে। তাই তিনি মাংস না খেয়ে চোখ বুজে রইলেন। তাঁর চোখ দিয়ে জলধারা নাবতে লাগল। এই অবস্থা দেখে তিন্নাডু ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ কত ভাবে যে চোখের অসুখ সারানোর চেষ্টা করল তার ইয়ত্তা নেই। তাতে চোখের জল বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা চোখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল।

তিন্নাডু ভাবতে পারছিল না তারপর কি করবে। সে ভাবল চোখের ওষুধ চোখ। হঠাৎ সে নিজের একটা চোখ তরবারি দিয়ে উপড়ে ফেলে ঐ চোখ শিবের রক্ত ঝরা চোখে পুরে দিল।

তারপর শিবের অন্য চোখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল।

"কোন ভয় নেই। তোমার এই চোখও ভাল করে দিচ্ছি।" এ কথা বলে তিন্নাডু নিজের অন্য চোখটাও উপড়ে ফেলতে তরবারি তুলল। তৎক্ষণাৎ শিব প্রত্যক্ষ হয়ে তিন্নাডুর হাত ধরে ফেলে বললেন, "থাম।"

"প্রভু, আপনি আমাকে যে বর দিতে চান তাই দিন। আমি আর আপনার কাছে কি বর চাইব" তিন্নাডু একথা বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। অন্য ভক্তও ততক্ষণে সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। শিব তাদের দুজনকে আবার সংসারের মায়াজালে জড়াতে না দিয়ে নিজের মধ্যে বিলীন করে নিলেন।

রাক্ষসী চিত্র

উত্তর আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া নামক রাজ্যে ব্লৈত নামে এক স্থানে এই চিত্র আছে। সমতল ভূমি থেকে এই চিত্রের পূর্ণ রূপ দেখা যায় না। এই কারণেই এই চিত্র যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা হয়ত এই চিত্রের পূর্ণ রূপ দেখতে পাননি। এই ধরণের বহু চিত্র ঐ অঞ্চলে পাথরের টুকরো দিয়ে বানানো হয়েছে। এই চিত্র সমূহ বিমানে চড়েই ভাল ভাবে দেখা যায়। ১৯৪৩ সালে এই চিত্র সমূহের ফটো প্রথম তোলা হয়।

এখানে মাত্র দুটো চিত্রই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলে আরও অনেক বিরাট বিরাট চিত্র আছে। চিত্রগুলির গভীরতা বেশি নয়। কিন্তু দৈর্ঘ ও প্রস্থ অনেক বেশি। মানুষের চিত্রের দৈর্ঘ মাথা থেকে পা পর্যন্ত ১৭০ ফুট। আর প্রসারিত হাতে প্রস্থ ১৫৮ ফুট। এখানকার দ্বিতীয় চিত্র এক দীর্ঘ পুচ্ছ বিশিষ্ট এক ঘোড়ার। ১৫৪০ সালের আগে এই অঞ্চলে ঘোড়া ছিল না। তাই ধরে নেওয়া হচ্ছে চিত্রগুলি আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের অঙ্কিত।

ফটো : অনন্ত দেশাই
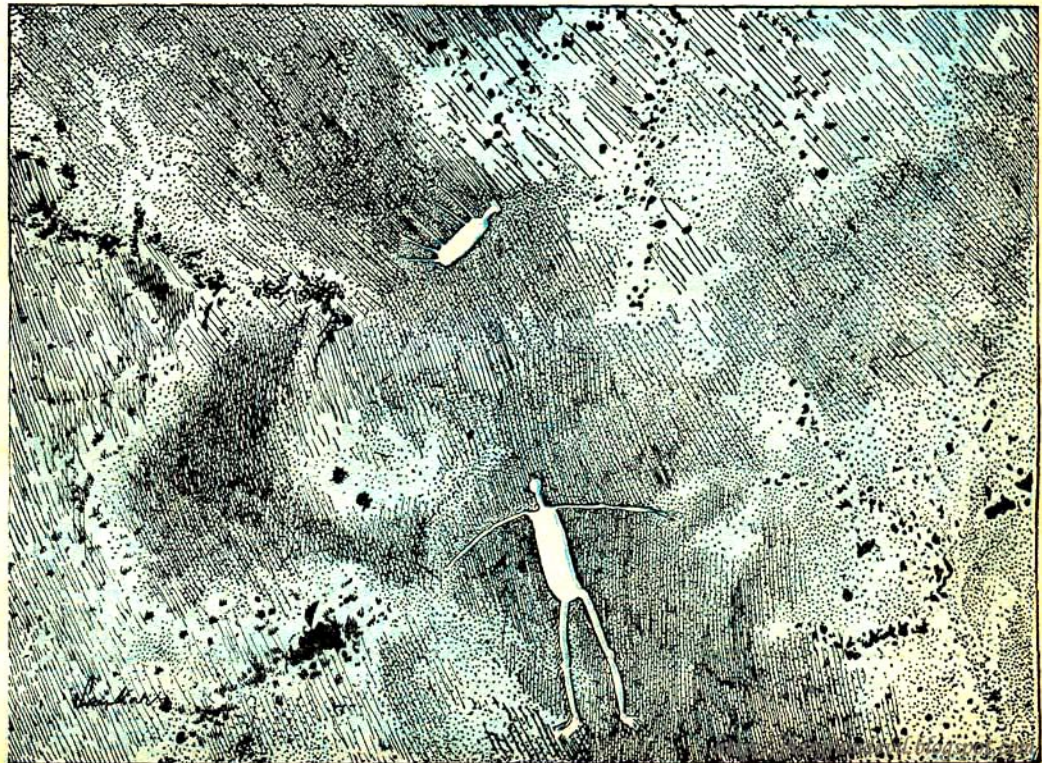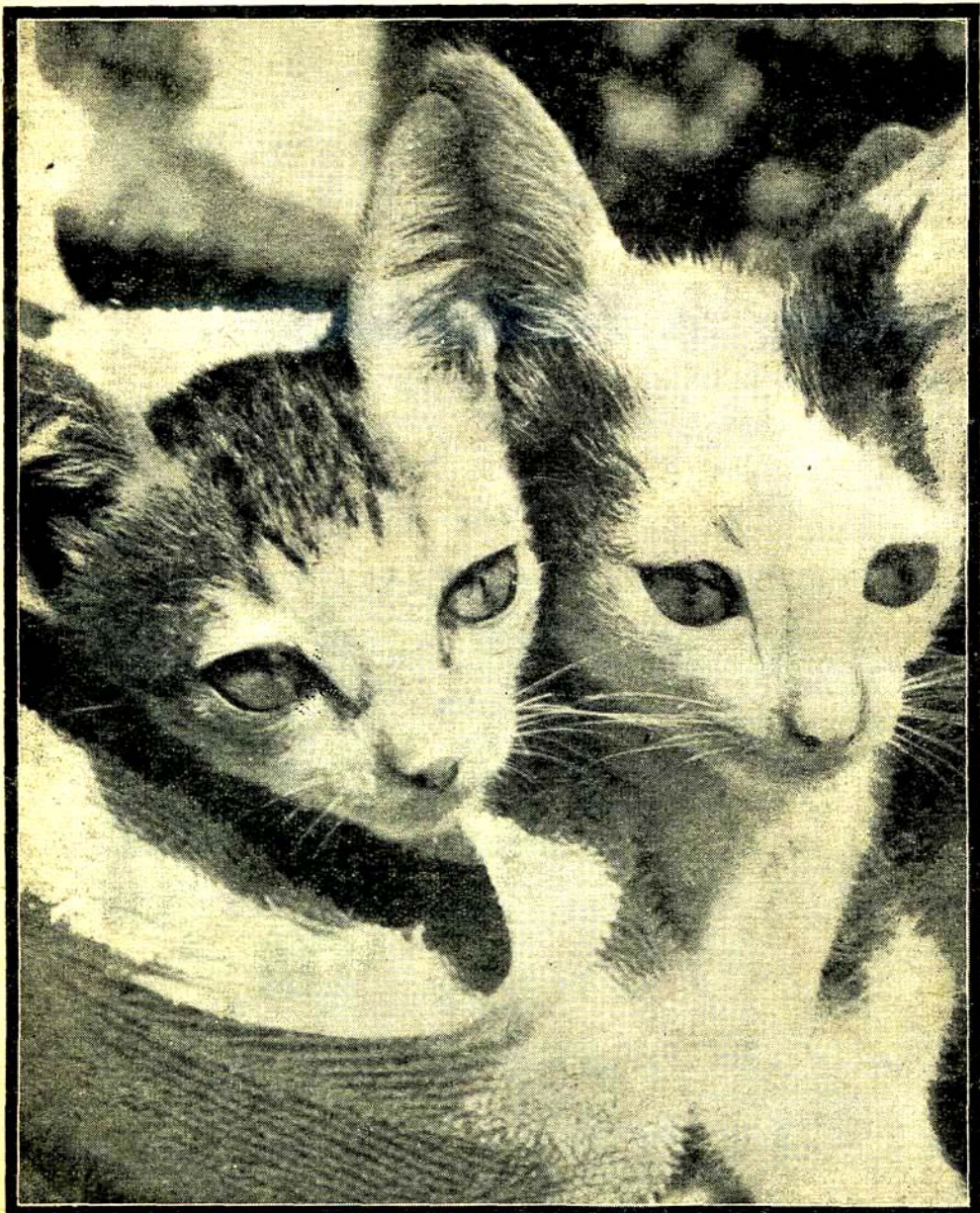
পুরস্কৃত
নাম

পাশাপাশি বেশ আছি

পুরস্কার পেলেন
নির্মলা গোস্বামী

ফটো ঃ অনন্ত দেশাই

২৭বি, সিকদার বাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৪

শান্তি চুক্তি করেছি
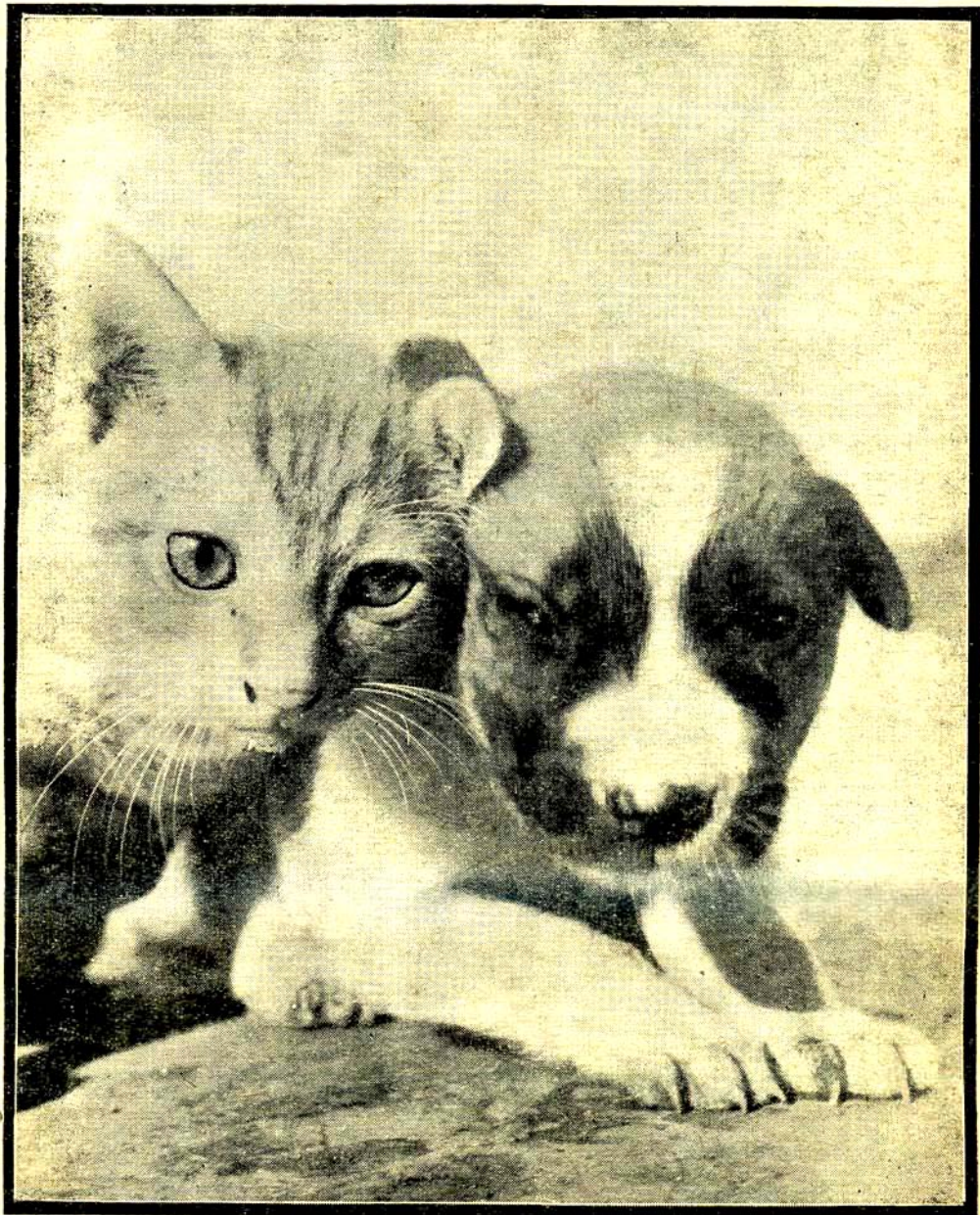
পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে জুলাই '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো সেপ্টেম্বর '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
দিল্লীর মসজিদ

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
আগ্রার মসজিদ

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

১. ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

২. পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো নদী কোনটি?

৩. কোন তারিখে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে?

৪. পৃথিবীর দ্বিতীয় সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কি?

৫. ভারতে কে প্রথম নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

৬. চাঁদে কে প্রথম পা রাখেন?

উত্তর লেখা শেষ হলেই তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ১২ টি চিকলেট্‌স-এর একটি খালি পাক ও নীচের ঠিকানা ইংরেজিতে লিখে নীচের কুপনটি পাঠিয়ে দাও:

Chiclets Products Officer C B
Post Box 9116, Bombay 25

কেবল ১৫ বছরের কম বয়েসের ছেলেমেয়েরাই এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে পারে।

প্রথম ১০০ টি নির্ভুল প্রবেশপত্রের মধ্যে (প্রতিটি ভাষায় ১০টি) প্রতিটি প্রবেশপত্রের জন্যে পাওয়া যাবে ৪টি কমিক কিম্বা 'ওয়ার্লড ১০০' ভিন্ন ভিন্ন ডাক টিকিট।

এখন চিকলেট্‌স ছ'টি সরেস স্বাদগন্ধে পাওয়া যায়: পিপারমেণ্ট, অরেঞ্জ, টুটি-ফ্রুটি, লেমন, পাইন-অ্যাপেল আর চকোলেট।

(তোমার নাম ও ঠিকানা ইংরেজিতে লিখবে)

নাম ....

ঠিকানা ....

....

....

আমি চাই [৪টি কমিক] কিম্বা ['ওয়ার্লড ১০০'] ভিন্ন ভিন্ন ডাক টিকিট (যেটি তোমার চাই তাতে টিক চিহ্ন লাগাও)।

চিকলেট্‌স® — মজার চুইংগাম ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' আর ক্যালসিয়ামে ভরা।

Photo by: A. L. SYED

Vapa